মধ্য এশিয়া থেকে সাইবেরিয়া



মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৬

মুদ্রাকর : স্বর্ণলতা ঘোষ, ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫৭/২, কেশবচন্দ্র
সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

মাকে

'তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল
দু' বিঘার পরিবর্তে'

ভূমিকা

প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিবর্তন-এর সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমার মত প্রবীণদের তুলনায় বয়সে অনেক নবীন। কিন্তু বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গের নবীন সাংবাদিকদের মধ্যে কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম অগ্রগণ্যদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। সাংবাদিকতার নানা ক্ষেত্রে তিনি ইতিমধ্যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এই বছরের (১৯৫৫ সালের) শারদীয় সংখ্যা পরিবর্ত্তন আমার হাতে আসার পরেই একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধ আমার চোখে পড়লো—যার নাম সাইবেরিয়া। আমাদের দেশে ভ্রমণ সাহিত্যের পাঠক অনেক, আমিও তাঁদের একজন। মনে পড়ে প্রথম যৌবনে জলধর সেনের হিমালয় ভ্রমণ যেমন আমার কৌতুহল উদ্রেক করেছিল, তেমনি মুগ্ধ করেছিল প্রবোধকুমার সান্যালয়ের মহাপ্রস্থানের পথে। কিন্তু সাইবেরিয়ার মত বরফের ঘুমন্ত দেশে এ পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী পর্যটক কিম্বা বাঙ্গালী সাংবাদিক পরিভ্রমণে গিয়েছেন, তা আমার জানা ছিল না। সুতরাং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাইবেরিয়া পরিদর্শনের মত দীর্ঘ প্রবন্ধটি আমি যেন গণ্ডুষে পান করে ফেললাম। বিশেষত: সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে আমি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ও শ্রদ্ধান্বিত বলে সাইবেরিয়া সম্পর্কেও আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল, যদিও আমি নিজে ওই দেশ ভ্রমণের কোন সুযোগ পাইনি। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র কেবল সোভিয়েত ভূমিতে নয় পৃথিবীর সর্বত্র এক নব যুগ ও নব জীবনের সঞ্চার ও আশার উদ্রেক করেছে। এই বিপ্লবের গুরু স্বয়ং লেনিন জারের দণ্ডাদেশে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন. এবং সাইবেরিয়াকে আমরা জানতাম কয়েদীদের নির্ব্বাসন ও নিপীড়ন ভূমি রূপে। আর জানতাম সেখানে বারোমাস প্রচণ্ড বরফের একচেটিয়া রাজত্ব—যেখানে শীতকালে হিমাঙ্ক নেমে যায় শূন্য ডিগ্রীরও নীচে

—৫০ পর্যন্ত। সুতরাং সেই আজব দেশে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী সাংবাদিক পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন, একথা জেনে আমি গভীর আগ্রহে সেই দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়ে দেখলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমি সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে বিশেষ পড়াশুনা করলেও সরলভাবেই স্বীকার করবো যে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ পড়ার আগে আমি সাইবেরিয়া সম্পর্কে অন্য অনেকের মত অন্ধকারেই ছিলুম। অতএব শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ যে, তিনি সাইবেরিয়া সম্পর্কে এই আশ্চর্য্য প্রবন্ধটি লিখে আমাদের চোখের দৃষ্টি যেন নতুন করে খুলে দিয়েছেন।

অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তিনি সাইবেরিয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, এক কথায় তা অনবদ্য। তাঁর এই বিশদ ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে কোন গালগল্প বা রোমান্টিক কল্পনার অর্থাৎ রম্য রচনার ধরণ নেই। দক্ষ সাংবাদিকের মত তিনি সাইবেরিয়া সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের চেয়েও বৃহত্তর আয়তনের এই বিশালদেশ, যা ভারতবর্ষের চেয়েও তিনগুণ বড়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই ঘুমন্ত দেশের আদিম বাসিন্দাদের মধ্যে তাদের নিজস্ব সভ্যতার কিছু সম্পদও ছিল, আর ছিল, কিম্বা আছে সাইবেরিয়ার মাটির নীচে অগাধ খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। এই প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের বুঝি কোন তুলনা নেই। আমরা কজন জানি যে, এই বিরাট ভূখণ্ডের মাটীর নীচে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ খনিজ সম্পদ আর জ্বালানীর ঐশ্বর্য। কয়লা, সোনা, হীরা ইত্যাদি কি না আছে সাইবেরিয়ার মাটীর নীচে। সাইবেরিয়ার যার বাংলা অর্থ ঘুমন্ত নগরী, সে কিন্তু আজ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের আশীর্ব্বাদে মোটেই ঘুমন্ত নয়। সম্পূর্ণ জাগ্রত এবং আধুনিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম উন্নত দেশ। এই বিশাল দেশে, যার আয়তন ১ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, তার অধিকাংশ স্থানে আজ গড়ে উঠেছে আধুনিকতম জীবনযাত্রা সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। পাইওনীয়র ক্যাম্প থেকে বিজ্ঞানের আকাদেমী পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু আজ

কি সঙ্গীত ও নৃত্যকলাও।

এমন একটি আশ্চর্য দেশে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে পরিভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন, বোধ হয় অনেক সাংবাদিক সে কথা জেনে তাঁর প্রতি ঈর্ষা বোধ করবেন। আর এই চমৎকার রচনাটির জন্য তিনি সাইবেরিয়ার প্রায় সমস্ত দিক যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সে জন্য তাঁকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কিন্তু মনে রাখা দরকার তাঁর এই প্রবন্ধটি কেবল সাংবাদিকের শুকনো তথ্য ভরা কোন রসকষহীন রচনা নয়। এর মধ্যে সাহিত্য রসের এবং রচনাভঙ্গীর শিল্পগুণও প্রচুর আছে। তাঁর উপসংহারের কাব্য-মণ্ডিত মন্তব্যটি লক্ষ্য করার মত। আশা করি তাঁর সাইবেরিয়া বাঙ্গালী পাঠককে এক নতুন সমৃদ্ধ জগতের সন্ধান দেবে। তাঁর কলম আরও জয়যুক্ত হোক।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিবির
১৩২, নগেন্দ্রনাথ রোড
কলিকাতা ৭০০০২৮

মধ্য এশিয়া ঃ ঘুমের দেশে সূর্যোদয়

মসকো থেকে যাচ্ছি কাজাখস্তানের রাজধানী আলমা আটা। প্রায় চার হাজার কিলোমিটার পথ। এয়ারোফ্লোটের বিরাট প্লেন যাত্রীতে ঠাসা। আজ জুলাই মাসের শেষ দিন। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্কুল কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি। গোটা ইউরোপ জুড়ে ট্যুরিস্ট সিজন চলছে। সকলেরই এখন উড়ু উড়ু মন। স্কুলের ছেলেমেয়েরা সবাই পাইয়োনিয়র শিবিরে। বয়স্করা ঘর ছেড়ে যার যেখানে ইচ্ছে বেড়াতে বেরুচ্ছেন। মসকো শহর ট্যুরিসটে গমগম করছে। হোটেলে জায়গা নেই। এমনকি দুপুরে রেসটুরেনটে খেতে গেলে লাইন দিতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্লেনের অধিকাংশ যাত্রী কাজাখস্তানের বাসিন্দা। ছেলেমেয়ে, বাকস-পেটরা দেখলেই বোঝা যায়। ছুটিতে রাজধানী বেড়াতে এসেছিল, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আলমা আটা থেকে মসকো ট্রেনও আছে। দিন তিনেক লাগে। কিন্তু বড় একটা কেউ ট্রেনে মসকো-আলমা আটা যাতায়াত করে না। প্লেনের ভাড়া সোভিয়েত নাগরিকদের জন্য বেশ সস্তা। আমাদের অর্থাৎ বিদেশীদের দিতে হয় প্রায় দেড়গুণ।

আমার সহযাত্রী রাশিয়ান সাংবাদিক এরিখ। চব্বিশ বছরের তরুণ। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলে। কিন্তু সোভিয়েত প্রবাসে ওই আমার আপনার জন। এক কথায় অন্ধের যষ্টি। একটু চোখের আড়াল হলেই তাই অন্ধকার দেখি। কারণ ওকে ছাড়া আমার প্রতিমূহূর্ত অচল। কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও ইংরেজী জানা কাউকে পাব না। এই যে এত মানুষজন, এত পোসটার, প্লেনের ভেতর মাঝে মাঝে ঘোষণা এর সব কিছুর অর্থ আমার কাছে অজানা।

আলমা আটা পৌঁছালাম নির্বিঘ্নে। বিদেশীদের জন্য এয়ারপোরটে আলাদা লাউঞ্জ। স্বদেশীদের জন্য আলাদা। দেশের মধ্যেও

বিমান ভ্রমণে বিদেশীদের পাশপোরট দেখাতে হয়। স্বদেশীদের ক্ষেত্রে লাগে আইডেনটিটি কারড। এরিখ ওটাকেও বলে পাশপোরট। ফটো দেওয়া বিশেষ পরিচয়পত্র। সোভিয়েত নাগরিকদের এটি সব সময় পকেটে করে রাখতে হয়। বিমান ভ্রমণে এটি দরকার। হোটেলে ঘর ভাড়া পেতে গেলেও লাগে। চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে তো দরকার হয়ই। কিন্তু এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাবার ব্যাপারে কোনও পাশপোরট বা অনুমতি পত্র নেই। যে যেখানে খুশি যেতে পারে। সড়ক পথে তো পাশপোরট দেখাবারই দরকার নেই। তবে একমাসের বেশি কোথাও গিয়ে থাকলে পাশপোরট নিয়ে পুলিশের কাছে রেজিসট্রি করিয়ে আসতে হয়। এ একরকম পাকা ব্যবস্থা। প্রতিটি নাগরিকের পরিচয়পত্র আছে। স্থায়ী ঠিকানাও সরকারি কর্তৃপক্ষের জানা। কাজেই অপরাধ করে এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। রাম রাতারাতি শ্যাম হয়ে যেতে পারে না। কারণ পরিচয়পত্রে প্রত্যেকেরই ছবি আছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও পালটায়।

আলমা আটা এসে পৌঁছালাম রাত আটটা নাগাদ। কিন্তু এসে মনে হচ্ছে বেলা ত্বপুর। রাত এগারটা পর্যন্ত আলো থাকে। আটটার সময় তো চনবনে রোদ্দুর। আবহাওয়া ঠিক কলকাতার এপরিল মাসের মত। বেশ গরম। তবে হিউমিডিটি নেই। ঘাম হয় না। মসকোতে শীত বেশি পাইনি। তাহলেও গায়ে একটা জ্যাকেট দিতে হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে জ্যাকেটটি বোঝা হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত লোককে দেখছি গায়ে একটি শারট অথবা গেঞ্জি পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার সাম্প্রতিক সোভিয়েত ভ্রমণের ভ্রমণসূচি আমি নিজেই নির্বাচন করেছিলাম। বেছে নিয়েছিলাম মধ্য এশিয়ার ত্বটি রিপাবলিক—কাজাখস্তান ও তাজিকিস্তান। পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র সোভিয়েত সোসলিসট রিপাবলিক। ২ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কিলো-মিটার তার আয়তন। সারা ত্বনিয়ার এক ষষ্ঠাংশ জুড়েই সোভিয়েতের পরিধি। ইওরোপের অর্ধেক ও এশিয়ার এক তৃতীয়াংশ নিয়ে বসে

আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। উত্তরে চোলয়ুসকিন অন্তরীপ থেকে দক্ষিণে টারকমোনিয়া পর্যন্ত দূরত্ব হল পাঁচ হাজর বর্গ কিলোমিটার। আর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত দূরত্ব দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। বিশ্বের ২৪টি সময় পরিধির ১১টি চলে গেছে সোভিয়েতের উপর দিয়ে। একই দেশের মধ্যে রাজ্য থেকে রাজ্য সময়ের ফারাক। সুদূর প্রাচ্যে একেবারে পূবের প্রান্তসীমায় যখন সকাল তখন মসকোতে সন্ধ্যা।

এই বিরাট বিশাল দেশ মাত্র দশ-এগারো দিনের মেয়াদে ঘোরা বা দেখা ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের মতই ব্যাপার। তাতে শুধু বুড়ি ছুঁয়ে চলে যাওয়া যায় মারকিন ট্যুরিসদের মত। কিন্তু আমি যা চাই, মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় তা মেলা ভার। তাই আমি দুটি রাজ্যের মধ্যেই আমার ভ্রমণসূচি সীমিত রাখতে চেয়েছিলাম। তাছাড়া মধ্য এশিয়ার এই রিপাবলিকগুলি ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর।

১৯১৭ সালে অকটোবর বিপ্লবের আগে কাজাখস্তানের ১৯টি অঞ্চলের মধ্যে মাত্র দু তিনটি অঞ্চলে শিল্প ছিল। রাজ্যের সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন এক সঙ্গে জুড়লেও একটি ডিজেল রেল ইনজিনের শক্তির চেয়েও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়নি। লেখাপড়ার প্রসার যেভাবে চলছিল তাতে গোটা মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করতে ৪৬০০ বছর লেগে যেত। এই হিসাব জারের আমলে ১৯১৪ সালে রাশিয়ার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কাজাখস্তান ছিল মুখ্যত অনগ্রসর দরিদ্র একটি রাজ্য। বহু উপজাতির বাস এই রাজ্যে। যাদের উপজীবিকা ছিল কৃষি ও মেষপালন।

এদিক থেকে তাজিকস্তানের সংস্কৃতি পুরাতন, ঐতিহ্য প্রাচীন। তাজিক-পারসি ধ্রুপদী সাহিত্যের ধারায় স্নাত তাজিকস্তানের মানুষ। যাদের মাধ্যে জন্মেছিলেন বিখ্যাত পারসি কবি শাহনামার রচয়িতা ফিরদৌসি। কিন্তু অন্যদিকে দেশের কোন উন্নতিই হয়নি। ১৯৩২ সালের আগে দেশের কোন শিল্পোন্নয়ন সুরু হয়নি। ১৯২৯ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আধুনিক প্রাথমিক স্কুল—২৯ জন ছাত্রকে নিয়ে।

এছাড়া আরও আগ্রহ ছিল মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলি সম্পর্কে। এখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। বিশ্বের অন্যান্য দেশে মুসলমান ধর্মনেতারা আধুনিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করে আসছেন। কিছু কিছু আরব দেশ তো নিজেদের রেখে দিয়েছে মধ্যযুগে। ঘরের পাশে পাকিস্তান ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। সোভিয়েতের মুসলমান সমাজ কিভাবে গ্রহণ করেছে কম্যুনিস্ট বিপ্লবকে! বিপ্লবের পর যে গোটা সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে গেল তার সঙ্গে কেমন করে মানিয়ে নিতে পেরেছে সেখানকার মুসলমানরা—এসব প্রশ্ন বহুদিন ধরেই মনের মাঝে উঁকি-ঝুকি মারত। এবার তাই সুযোগ হয়ে গেল।

* * *

আলমা-আটা এয়ারপোরটে ট্যাকসি পাওয়া মুশকিল। তবে বেশ সুন্দর ব্যবস্থা এয়ারোফ্লোটের। চলন্ত প্লেনেই ঘোষণা হল, যারা এয়ারপোরটে নেমে ট্যাকসি চান তারা টাকা দিয়ে কুপন কেটে নিতে পারেন। তাদের জন্য ট্যকসির ব্যবস্থা থাকবে। এরিখ ট্যাকসির কুপন কিনল। কিনে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিল। কারণ শহরে ঢোকার পথে রাস্তার মোড়ে অনেক লোককে দেখলাম ট্যাকসির জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।

ভেবেছিলাম ঢুকব এক প্রাচীন শহরে। রুক্ষতা থাকবে তার সারা অঙ্গ জুড়ে। মাঝে মাঝে দেখা যাবে উট চলেছে মুখটি তুলে।

কিন্তু যত শহরের ভেতর ঢুকছি ততই মনে হচ্ছে এলেম নতুন দেশে। চারিদিকে শুধু সবুজ গাছ আর গাছ। রাস্তার দুধারে সবুজ ডানা মেলে দাঁড়িয়ে সারি সারি ছায়া তরু। বিরাট চওড়া রাস্তা। চারটি করে লেন। দুপাশে আবার পায়ে চলা রাস্তা আর সাইকেল, ট্রাক।

এই হল কাজাখস্তানের রাজধানী—আলমা আটা।

আলমা আটা শহরের সব কিছুই এখন নতুন। বাড়ি ঘর বাজার দোকান হোটেল সবই গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে তৈরি। আমরা যে

হোটেলে উঠলাম সেটিও তৈরি হয়েছে হালে। আলমা আটা শহরে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। এজন্য আগে বড় বড় বাড়ির চাল ছিল না। এখন অধিকাংশ উঁচু বাড়ি তৈরি হয়েছে। শহরের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি ২৫ তলার একটি হোটেল। সেটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে ভূমিকম্পের ফলে তার কোন ক্ষতি হবে না।

ষাট বছর আগে কাজাখস্তানের জনসংখ্যাও বেশি ছিল না। অথচ আয়তনে কাজাখস্তান ভারতবর্ষের চেয়ে একটু ছোট। পশ্চিম থেকে পূর্বে দূরত্ব তিনহাজার কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে ব্রিটেন, ফ্রানস, ফেডারাল রিপাবলিক অব জারমানি, স্পেন, ফিনল্যানড ও সুইডেন এই ছটি দেশ কাজাখস্তানের মধ্যে ঢুকে যাবে। তবে কাজাখস্তানের গুরুত্ব তার আয়তনে নয়—গুরুত্বটি হল এটি চীনের সঙ্গে সোভিয়েতের সীমান্ত রাজ্য। রাজধানী আলমা আটা থেকে চীন সীমান্ত খুব কাছেই। এছাড়া এই আলমা-আটার কাছেই আছে পাহাড়ের ওপর 'তিয়েন সাও কসমিক রে' গবেষণা কেন্দ্র। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এখানে এসে গবেষণা করেন।

হোটেলে এলে বোঝা যায় আলমা আটা পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান হিসাবেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে অধিকাংশ পর্যটকেরই গন্তব্যস্থল প্রতিবেশী রিপাবলিক উজবেকিস্তান। তাসখন্দ, সমরখন্দ, বুখারা হয়ে তারা ফেরেন। ইউরোপ থেকে বাসে করে বেড়াতে আসেন অনেকে। সেদিনই রাতে হোটেলের বারে কিছু তরুণ জারমান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ হল। সবে স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছে। পূর্ব জারমানি থেকে দল বেঁধে বাসে করে বেড়াতে এসেছে।

ওদের মধ্যে একটি ছেলে ইংরেজী জানে। তার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরজীতে কথা হল। এরিখ ওদের দলের একটি মেয়ের সঙ্গে নাচল। আমি মজা করার জন্য পাশের মেয়েটির ও তার বয়ফ্রেনডের হাত দেখার ভান করলাম। তারপর কপট গাম্ভীর্য নিয়ে ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দারুণ মনগড়া কথা বলতে শুরু করে দিলাম। বস্তুতান্ত্রিক মনও বুঝি ক্ষণিকের দুর্বলতায় গলে যায়। জ্যোতিষীরা কেন এত প্রভাবশালী

তার একটা পয়খ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে হাতে কোন কাজ ছিল না। রবিবার সব বন্ধ। তবে কাছেই বাজার। এরিখকে বললাম, চল বাজার দেখে আসি।

হোটেল থেকে বাজার মিনিট পাঁচেকের মত পথ। বিরাট বাজার, আয়তনে কলকাতার নিউ মারকেটের মত, তবে বাজারটি দোতলা। ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঁচু সিমেনটের বেদির ওপর জিনিসপত্র নিয়ে নানা বয়সী লোকেরা বসে। এরা এসেছে আশেপাশের গ্রাম থেকে। কালেকটিভ ফারমের চাষীরা নিজেদের বাড়ির সঙ্গে কিছু জমি রাখতে পারে। সেখানে তারা আনাজপত্র ফলিয়ে বিক্রি করতে পারে। তবে কালেকটিভ ফারম থেকেও বাজারে বিক্রির জন্য এনেছে অনেক কিছু। তার মধ্যে কিসমিসের বাজার বেশ জমজমাট। ৬৫ টাকা কেজি কিসমিসের। আমি কিছু কিনলাম। খবরের কাগজের প্যাকেটে মুড়ে মাল দেওয়ার সময় রাশিয়ান ভাষায় আমাকে কি যেন বলল লোকটি। এরিখ বলল : তোমায় ইনডিয়ান বলে চিনতে পেরেছে। এরা সবাই ভারতীয় সিনেমা দেখে। আমি হাসলাম। লোকটি বলল : রাজকাপুর। রাজকাপুর। এরিখ বলল, ও বলছে, ও শুনেছে রাজকাপুর নাকি মারা গেছে? আমি বললাম, বালাই ষাট। মারা যাবে কেন? লোকটি তখন আশ্বস্ত হল।

আমি এর আগেই শুনেছিলাম সোভিয়েতের লোকেরা দুজন ভারতীয়কে চেনে, রাজকাপুর ও নেহেরু। কথাটা সত্যি। তবে দুজন নয় তিনজন। আর একজন শ্রীমতী গান্ধী। সর্বত্র এই তিনজনের কথা শুনেছি। ভারতীয় ছবি রুশভাষায় ডাবিং করে সোভিয়েতের সর্বত্র নিয়মিত দেখানো হয়। অধিকাংশই হিন্দি ছবি। নাচ-গান-স্বপ্ন ও অলীকের জগৎ। বিদেশীদের কাছে বেশি করে রোম্যান্টিক মনে হয়। কিন্তু তাদের মাঝে রাজকাপুর কিভাবে এত জনপ্রিয় হলেন সেটাই আশ্চর্য। হয়তো তাঁর চেহারার সঙ্গে মধ্য এশিয়ার লোকেদের মিল আছে। তাছাড়া আওয়ারার কাহিনীও ছিল মর্মস্পর্শী। সেটা ওদের মনে ধরেছে। আমাকে মসকো প্রবাসী বিশু দাসগুপ্ত

বলেছিলেন : ছবি দেখে ওরা অভিভূত হয়। কাঁদে। ওঁর বান্ধবী তানিয়া আমাকে বলেছিলেন, অনেক ভারতীয় ছবি দেখে হাউ হাউ করে কেঁদেছি।

কম্যুনিস্ট বলতে যদি কেউ রসকষহীন শুষ্ককাষ্ঠ নিষ্প্রাণ এক কাঠের পুতুল ভাবেন তাহলে তিনি ভুল করবেন। এমন ধারণা এদেশের কোন কোন কম্যুনিস্ট নেতাদের দেখে হতে পারে। কিন্তু ওদেশে কম্যুনিসট পারটি, কম্যুনিসট বলতে সৌন্দর্য সচেতন সংবেদনশীল ও হৃদয়বান মানুষের কল্পনা করেছে। তাই আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে ভোগের এত উপকরণ আছড়ে পড়ছে। এত গান-নাচ-কলা-সংস্কৃতির আয়োজন। ওরা শুধু মিছিল করে শ্লোগানই দেয় না, জীবনকে আর পাঁচটি সুখী মানুষের মত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগও করে। বিকেলে প্রেমিকের জন্য ফুল কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরে। ছেলেমেয়েরা উইক-এনডে ডিসকোতে যায়। প্রচুর মদ্যপান করে, বই পড়ে, রেকরড শোনে।

বাজারে দেখলাম টম্যাটো বেগুন সবই পাওয়া যায়। টম্যাটোর কেজি ২০ কোপেক। অর্থাৎ আড়াই টাকার মত। আঙুরের দেশ। বাজারেও প্রচুর আঙুর। ২৬ টাকা কেজি (২ রুবল) বিফ ২৬ টাকা কেজি। ভেড়ার মাংস ১'৯০ রুবল কেজি। মুরগির দাম আবার একটু বেশি আড়াই রুবল। রুই মাছ ১'১০ রুবল অর্থাৎ ১৪ টাকার মত। অন্য সামুদ্রিক মাছ ৪০ থেকে ৮০ কোপের কেজি। মাছটা বেশ শস্তা। পাঁউরুটি ২৩ থেকে ২২ কোপেক পাউণ্ড।

যারা বিক্রি করছে, যারা কিনছে তাদের প্রত্যেকেরই ভাল ভাল পোশাক। ক্রেতার অভাব নেই। অনেকে বাচ্চাদের নিয়ে বাজার করতে এসেছেন। বাজারের সামনে ছোট ছোট পাবলিক সুইমিংপুল রয়েছে। সেখানে বাচ্চারা সাঁতার কাটছে। একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে। যেমন কোন বিখ্যাত জায়গায় পেশাদার ফটোগ্রাফারেরা থাকে। ঠিক তেমনি। তার কাছে ফটো তুলবার জন্য ভিড়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা জিনিস দেখেছি—একেবারে বিক্রেতাদের বাজার, কিছু একটা নিয়ে বিক্রির জন্য এলেই হল—খদ্দেরের অভাব নেই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিনারেল ওয়াটারের মেশিন আছে। পয়সা দিলে গেলাসে এক গেলাস জল পড়ে আপনা আপনি। প্রচুর লোক ঘুরছে ফিরছে জল খাচ্ছে। এছাড়া পানীয় জল কোথাও পাবার উপায় নেই। ফুটপাথে যদি কেউ কেক কিংবা পেপসি কোলা নিয়ে বসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কিউ পড়ে যাবে ঃ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মাল শেষ। বিক্রি ব্যবস্থার সবকিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে তাই যে কেউ খুশিমত মালপত্র নিয়ে যেখানে সেখানে বসে যেতে পারে না। বিশেষ করে খাদ্যবস্তুর বেসরকারি বিক্রি নিষিদ্ধ। কারণ খাবারের মান যাতে কোনমতে নেমে না যায় সেজন্য সরকার সর্বদা সচেষ্ট।

বাজার থেকে ফেরার পর দুপুরে একজন ইংরেজী জানা মহিলা গাইড এলেন। এই গাইডরা সবাই সোভিয়েত পর্যটন সংস্থা ইন ট্যুরিসটে কাজ করেন। বিদেশী ভাষা জানা থাকলে ওদেশে চাকরি পেতে নানা সুবিধা হয়। বিদেশী ভাষা শেখবার জন্য ইনসটিটিউট আছে। তবে যারা ভবিষ্যতে বিদেশী ভাষায় বিশেষজ্ঞ হতে চায় তারা ছোটবেলা থেকেই তার চর্চা শুরু করে দিতে পারে স্পেশ্যাল স্কুলে ভর্তি হয়ে। এই সব স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজী শেখান হয়। ভাষা শিক্ষার জন্য এলাহি ব্যবস্থা সেখানে। তবে সাধারণ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী থেকে বিদেশী ভাষা শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে সেটি কোন কাজের নয়। নামে বিদেশী ভাষা পড়ান হয়। আসলে খুব একটা জোর দেওয়া হয় না। ঠিক আমাদের সংস্কৃত শেখাবার মত ব্যাপার। ছাত্ররা পাশ করে, কিন্তু কিছু শেখে না। এক বর্ণ সংস্কৃত লিখতে বা বলতে পারে না।

ইংরেজী জানা গাইড আমাকে বললেন ঃ আলমা আটার একটি [illegible] আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাব। আপনি মেডোর নাম শুনেছেন ?

কাজাখস্তান আসার আগে কিছু বইপত্র পড়েছিলাম। তাতে মেডো সম্পর্কে কিছু কথা ছিল।

বললাম, হ্যাঁ শুনেছি। পাহাড়ী ধস বন্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি ড্যাম আর পাহাড়ের ওপর রয়েছে স্কেটিং রিং।

ভদ্রমহিলা বললেন: হ্যাঁ। এই যে এমন সুন্দর আলমা আটা শহর দেখেছেন আর চারপাশের ওই পাহাড়গুলো সময় বিশেষে কি ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

আলমা আটার চারপাশে পাহাড়ের ওপর আছে বরফ। সেই হিমবাহ কাদামাটি শুদ্ধ প্রবল বেগে নেমে আসে। শুধু ধস হলে তার গতি থাকে না। কিন্তু তরল হিমবাহের গতি প্রবল। পাহাড়ের হিমবাহ নেমে অতীতে শহরের আশেপাশে ৭০টি হ্রদের সৃষ্টি করছে।

গত ৮০ বছরে ১৪ বার হিমবাহ প্রবাহিত হয়েছে। তার মধ্যে দুবারের হিমবাহ ছিল বিধ্বংসী। ১৯২১ সালের ঘটনার কথা অনেক বৃদ্ধের স্মরণে আছে। ৮৯ মিটার উঁচু হিমবাহ স্রোত মাটি ও কাদাশুদ্ধ শহরের দিকে ধেয়ে আসে। সামনে যা পায় তাকেই ধ্বংস করে। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আর একটি ধস নেমে আট হাজার বছরের পুরানো ইসিক লেক একেবারে বুঁজিয়ে ফেলে।

এরপর শহর রক্ষায় এগিয়ে আসেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বিস্ফোরকের সাহায্যে ৬০ লক্ষ টন ওজনের আড়াই লক্ষ কিউবিক মিটার পাথর সরিয়ে দেন। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ফলে পাথর ভেঙে পাহাড়ের একটি প্রাচীর তৈরি হয়, এরপর তৈরি হয় ১২০ মিটার উঁচু একটি ড্যাম। এই ড্যাম হয়ে দাঁড়ায় হিমবাহের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

এগিয়ে চলেছি মেডোর দিকে। তার আগে দেখে এলাম শহরের সেনট্রাল পারকের ওয়ার মেমোরিয়ল। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই। সরকার থেকে কোন মন্দির মসজিদ বা গীর্জায় অর্থ সাহায্যও করা হয় না। যদিও ধর্মচর্চা নিষিদ্ধ নয় কিন্তু দীক্ষিত কম্যুনিসটরা নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু এই ওয়ার মেমোরিয়ল বা বিপ্লবীদের

স্মারক শহীদ বেদীগুলি তাঁরা মন্দিরের মত পবিত্র স্থানে রক্ষা করেন ও পূজো করেন। সর্বত্র দেখেছি কোথাও কিছু এমন স্মারক থাকলেই কে বা কারা এসে নিত্য ফুল রেখে যান তার ওপর। আমাদের দেশের মত যত্র তত্র শহীদ বেদী গড়েও ওঠে না। আর বেদী তৈরির পর অনাদরে অযত্নে অবহেলায় সেগুলি জীর্ণ হয় না।

আলমা আটার পারকে যে ওয়ার মেমোরিয়ল রয়েছে তা আধুনিক ভাস্কর্যের এক অনুপম উদাহরণ। ঠিক এই ধরনের ওয়ার মেমোরিয়ল দেখেছিলাম ম্যানিলাতে আর পূর্ব বারলিনে। আলমা আটার ওয়ার মেমোরিয়ল যুদ্ধরত সৈনিকের বিরাট ব্রোঞ্জমূর্তির সামনে একটি বাঁধানো চত্বর। মাঝখানে জ্বলছে অনির্বান অগ্নিশিখা। দুজন অচল অনড় তরুণ শান্ত্রী রাইফেল কাঁধে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে। আর দুজন শাদা পোশাক পরা তরুণী দুপাশে পায়চারি করছে।

আলমা আটা থেকে মেডো ২০ মাইল পথ। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন শহরে বড়লোকের পাড়া বা গরিবের পাড়া নেই। নেই কোন বস্তি বা গ্রাম থেকে রুজির সন্ধানে আসা হাজার হাজার মানুষের স্যাক বা পথের ধারের ঝুপড়ি। অথচ যে কোন ধনতান্ত্রিক দেশে আপাত সম্পদ ও সমৃদ্ধির পিছনে এই সব বস্তি বেড়ে চলে দেহের ভেতর ক্যানসারের মত।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত কলকারখানার মালিকানা সরকারের হাতে। বাসগৃহ যোগাবার ভারও সরকারের। বাসগৃহ সমস্যার আগের থেকে যথেষ্ট উন্নতি হলেও সমস্যার পূর্ণ সমাধান এখনও হয়নি। কিন্তু তা বলে গৃহহীনদের ফুটপাথে বা রাস্তায় এসে দাঁড়াবার মত অবস্থাও হয়নি। শহর ও শহরতলীর সমস্ত এলাকা সমানভাবে উন্নত।

পথে যেতে যেতে আমাদের গাইড একটি সুন্দর অ্যাপারটমেন্ট হাউসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেনে, ওই বাড়িতে থাকেন তিনজন হিরো আরটিস্ট। হিরোদের জন্য সাম্যবাদী দেশেও একটু বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে। সাধারণের জন্য যেমন পরিবারের সদস্য

পিছু ফ্ল্যাটের আয়তন সীমাবদ্ধ। কিন্তু হিরোদের এই হিসাবের মধ্যে থাকতে হয় না একজন হিরো ছ সাত কামরার ফ্ল্যাটও পেতে পারেন। দোভাষী মহিলা বললেন : হি ইজ এ বিগ হিরো সো হিজ হাউস ইজ বিগ।

রবিবারের দুপুর। মেডোতে উইক এনড কাটাতে বহু লোকের ভিড়। বেশ চনবনে রোদ। তাই পুরুষেরা খালি গায়ে ঘুরছেন। মেয়েরা বিকিন পরে শুয়ে রোদে ট্যানড হচ্ছেন। একটা ছোটো রেস্তোরাঁ। স্যুভেনিরের দোকান। জায়গাটি মনোরম। শহর থেকে কয়েকশ ফুট উঁচু। সামনে পাহাড়। পাহাড়ের ওপর সবুজ ঘাসের আস্তরণ। এই ধ্যানগম্ভীর শান্ত সমাহিত প্রকৃতি যে হঠাৎ ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে কে বিশ্বাস করবে। টোকিও থেকে ওসাকা যাবার পথে ঘুমন্ত ফুজিয়ামাকে দেখে আমার বিশ্বাস করতে মন চায়নি যে ওই ধূসর নাতিদীর্ঘ পাহাড়টি একদা ছিল জাপানের মানুষের কাছে আতঙ্ক।

এই পাহাড়ের হিমবাহ স্রোত আটকাবার জন্য ড্যাম তৈরি করা হয়েছে। ড্যামের নিচে আছে ছোট্ট এক পাহাড়ী নদী। স্লুইস গেট দিয়ে তার জল আটকানো। প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানীদের লড়াইয়ে বিজ্ঞান যে জয়ী হয়েছিল তার প্রমাণ গত ১৯২১ সালের জুলাই মাসে হিমবাহ গলতে থাকে। বিপদের সংকেত পাওয়া মাত্র আলমা আটার নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর হিমবাহ স্রোত ১ কোটি ২লক্ষ ঘোড়ার শক্তি নিয়ে সজোরে ধাক্কা মারতে থাকে ড্যামের কংক্রিটের প্রাচীরকে। আমাদের দেশের ড্যাম হলে চুরমার হয়ে যেত। ১৯২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বন্যায় হিংলো ড্যামের অবস্থা নিজের চোখে দেখে এসেছি। কিন্তু আলমা আটার এই ড্যাম ভাঙেনি। ৫০ লক্ষ কিউবিক মিটারের মত পুরু পাথরের আস্তরণ এসে জড় হয়েছে বাঁধের নিচে। তবে ভয় ছিল বাঁধের ওপর জল উপচে পড়তে পারে। এ জন্য পাম্প করে জল বার করে নেওয়া হতে থাকে। আলমা আটার ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রকৃতি পরাভব মেনে ফিরে যায়।

শহরটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্তমানে এই ড্যামের উচ্চতা বাড়িয়ে ১৪৫ মিটার করা হচ্ছে : যাতে করে ৮০ লক্ষ কিউবিক মিটারের মত জল পাথর ও কাদা ড্যামটি ধরতে পারে।

আমাদের গাইড নিয়ে গেলেন স্পোরটস কমপ্লেকসটি দেখাতে। শুধু একটি ড্যাম নয়, সেই সঙ্গে জায়গাটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য একটি ক্রীড়া বিন্যাস গড়ে তোলা হয়েছে। ১৫ হাজার দর্শক বসতে পারে এমন একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। এটি স্পিড স্কেটিং ও আইস হকি খেলার জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই একটি মাত্র স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামটিতে ঢুকে দেখতে গেলে টিকিট কাটতে হয়। যদিও এখন খেলা হচ্ছে না। বরফের উপর স্কেটিং বা 'হলিডে অন আইস'. একবার কলকাতায় এসেছিল। আমি ১৯৬০ সালে পশ্চিম বারলিনে হলিডে অন আইস দেখেছিলাম। সেটা ছিল ব্যালে। অতি উপভোগ্য অনুষ্ঠান এবং শিল্পীদের বিশেষ ধরনের অনুশীলন দেখার মত।

আমাকে গাইড জানালেন : এই স্টেডিয়ামের বৈশিষ্ট্য হল স্টেডিয়ামের নিচ দিয়েই বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদীর শীতল জল। এই জল থেকেই বরফ তৈরি হয়। বেশ শীত পড়ে বলে শীতের সময় দর্শকরা ওভার কোট ছাতা নিয়ে আসেন। প্রায় তিন হাজার লোকের জিনিসপত্র রাখার মত ক্লোক রুম তৈরি করা হয়েছে ওখানে। বিভিন্ন প্রতিযোগীদের জন্য ৩৫০টি ঘর আছে স্টেডিয়ামের ভেতর। এছাড়া মেডোর নিজস্ব ডাকঘর ও টেলিগ্রাম ঘর আছে। আছে গ্যারাজ। বাইরে একটি পাঁচতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে পাহাড়ের ওপর। ওই বাড়িতে আছে হোটেল ও প্রেস সেনটার। আছে মেডিকেল রুম সিনেমা আর সান বাথের ব্যবস্থা।

* * *

সোমবার সকালে যিনি আমার পথ প্রদর্শিকা হলেন তিনি একজন কাজাখ তরুণী। রবিবারের গাইড ওরফে দোভাষী ছিলেন রাশিয়ান। কাজাখরা জাতিগত দিক দিয়ে মঙ্গোলিয়ান। টকটকে ফর্সা রঙ কালো

চুল। কাজাখস্তানের আরও যে সব উপজাতি আছেন তাঁরা হলেন উজবেক, কিরঘিজ, কারাকালনাক। কাউকে দেখলে মনে চীনা কিংবা জাপানী। আবার কারও তামাটে রঙ দেখে চমকে উঠতে হয়। একেবারে নেপালী কিংবা লেপচাদের আদল। কাউকে কাউকে ভারতীয় বলেও ভুল হয়।

কাজাখস্তান অবশ্য এখন যথেষ্ট মাত্রায় কসমোপলিটন। সব রিপাবলিকের লোকই সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাস করেন। উজবেক কিরঘিজ, উইগুর ও তুঙ্গালরা অনেকদিন ধরেই কাজাখ দেশে আছেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় (১৯৪১-৪৫) নাজিরা সাময়িকভাবে কিছু অংশ দখল করে নিলে বহু রাশিয়ান পালিয়ে কাজাখস্তানে চলে আসেন। তখন থেকে তাঁরা এখানে বাস করছেন। তাছাড়া একদা নানা দিক থেকে অনগ্রসর ছিল এই রাজ্য। এ কারণে বহু দক্ষ চাকরি নিয়ে রাশিয়ানরা এ রাজ্যে আসতে থাকেন। আলমা আটাতে শতকরা ৫০ জনই রাশিয়ান। তবে স্থানীয় জনসাধারণ রাশিয়ানদের বহিরাগত বিদেশী বলে মনে করে না। শক্তিশালী রুশ সংস্কৃতির দ্বারা পিষ্ট হবার কথাও কেউ মনে করেন না। আমেরিকা একজাতি গড়তে গিয়ে ভাষার ও ধর্মের মিলন সত্ত্বেও পুরোপুরি সফল হয়নি। সাদা কালোয় ভেদাভেদ সমস্যা ঘোচেনি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার জয় হয়েছে। এদেশে ১০০ জাতি বর্ণ ও ভাষার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা সম্ভব করেছে রুশ ভাষা ও কম্যুনিজমের আদর্শ। রুশ ভাষা সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৫টি রিপাবলিকেই অবশ্য পাঠ্য ভাষা। শুধু তাই নয়, এই ভাষার ব্যুৎপত্তি না থাকলে কাজকর্ম করা মুশকিল। যেহেতু সমস্ত দেশেই এখন শিক্ষিতের হার শতকরা ১০০ ভাগ, সেহেতু স্কুলে সবাই রুশ লিখতে পড়তে শিখেছে। প্রত্যেকটি জাতি ছোটবেলা থেকেই হয়ে উঠেছে দ্বিভাষিক। সে নিজের মাতৃভাষা শিখেছে। সেই সঙ্গে রুশ ভাষা। আঞ্চলিক ভাষার যা কিছু ভাল সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে রুশ ভাষায় অনুবাদ হয়ে যায়।

আজ আমাদের গন্তব্যস্থল বেতার দফতর। ওখানে বেতার ও টেলিভিশনের উপমন্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। এখানে এসে দেখছি অতিথিকে আপ্যায়ন করার জন্য টেবলের ওপর থাকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর গ্লাস। আর থাকে কিছু ফল। আঙুর আপেল গরমের দেশ বলে এখানকার লোকেরা মিনারেল ওয়াটার পান করে প্রচুর। পথে কোথাও ট্যাপ ওয়াটার দেখিনি মেশিনে পয়সা দিলে মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যায়। একটি কাঁচের গ্লাস রাখা আছে। সেই গেলাসে করে পথচারীরা পথের মোড়ে মোড়ে মেশিন থেকে জল খায়। আমি কোনদিন খাইনি। না ধুয়ে একই গ্লাস থেকে পাঁচজন জল খাচ্ছে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। আর ছেলেবেলায় স্বাস্থ্যের বইতে পড়েছি এটা স্বাস্থ্য-সম্মতও নয়। কিন্তু অত স্বাস্থ্য সচেতন জাত হয়ে ওরা দিব্যি এই ব্যবস্থা মানিয়ে নিয়েছে। সৌজন্য বিনিময়ের পর আমি টি. ভির. কথাই বেশি করে তুললাম। হোটেলে আমার ঘরে টি. ভি. আছে। চারটে চ্যানেল দুটি থেকে জাতীয় প্রোগ্রাম প্রচার হয় মসকো থেকে। একটি চ্যানেল আলমা আটা। কিরঘিজ ভাষার জন্য একটি চ্যানেল। টি. ভি. এদেশে আমাদের মত সরকার নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমী টি. ভি-র তুলনায় অনুষ্ঠানে জৌলুষ কম। শিক্ষামূলক আর সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানই বেশি প্রচার হতে দেখলাম। তবে প্রচুর নাচ-গান অভিনয় ও সিনেমার প্রোগ্রামও থাকে। ভাষা জানি না বলে অনুসরণ করতে পারিনি। তবে পশ্চিমী চলচ্চিত্রের মত সেকস ও ভায়োলেনস নেই। কাজেই অ্যাকশান একটু কম।

আমি প্রশ্ন করিলাম : আপনাদের রেডিও/টেলিভিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? জীবনের কোনদিকটাকে বেশি করে প্রতিফলিত করে?

উত্তরে তিনি বললেন : ২৬তম পারটি কংগ্রেস আমাদের ঘোষিত নীতির রূপায়ণই আমাদের উদ্দেশ্য।

সোভিয়েত রাশিয়ায় পারটিই রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রা।

পারটির আদর্শই রাষ্ট্রের আদর্শ। তাঁরা মনে করেন জনগণ ও পারটি অবিচ্ছিন্ন। কারণ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে পারটি। পারটির চিন্তাধারার বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু সোভিয়েত দেশে সকলেই পারটির সদস্য নন। পারটির সমর্থকও হয়ত সবাই নন। পারটির বিরোধিতা করে টিঁকে থাকা মুশকিল। তাহলে তো সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থারই বিরোধিতা করা। ডালে বসে ডাল কাটার মত ব্যাপার। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী নয়। আমরা যারা পশ্চিমী গণতন্ত্রের স্রোতধারায় লালিত তারা কিছুতেই 'কম্যুনিসট গণতন্ত্র'কে বুঝতে পারব না। সর্বদাই আমাদের কাছে সেটি সোনার পাথর বাটি বলে মনে হবে! ঠিক একটি ধর্মমতের মানুষ যেমন অন্য ধর্মমতকে বুঝতে পারে না।

অতএব রাষ্ট্রীয় ভাবনা অনুসারেই সোভিয়েত টেলিভিশনে মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে ২৬তম পারটি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত রূপায়ণ।

আমি প্রশ্ন করি : টি. ভি.-তে বিদেশী প্রোগ্রাম দেখান হয় কিনা?

উত্তর আসে : হ্যাঁ। যে সব দেশের সঙ্গে আমাদের বিনিময় কর্মসূচী আছে সে সব দেশের ছবি দেখাই। ফরাসি, জারমান ও ভারতীয় ছবি নিয়মিত দেখান হয়। আবার ঘুরে ফিরে ভারতীয় ছবির কথা আসে। মন্ত্রীমশাই নিজেই আওয়ারার কথা তোলেন। তাঁর মতে ওটি ওয়ানডারফুল ছবি। ভারতীয় অনেক তথ্যচিত্র দেখান হয় কাজাখ টি. ভি.-তে।

: জীবনের কোন কোন সমস্যাকে বেশি করে গুরুত্ব দেন?

: যেমন উইক হারভেসট। এটা একটা রিয়েল ফাইট। আমাদের এই যুদ্ধ ১৯২১ সাল পর্যন্ত চলবে।

পর পর কয়েক বছর ফসলের উৎপাদন হ্রাস নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষভাবে চিন্তিত। এর ওপর আমেরিকা গম পাঠান বন্ধ করে দিয়েছে। অত বড় দেশ হলে কি হবে, পর্বত, মরুভূমি, বনভূমি মিলিয়ে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র চাষযোগ্য জমি সে দেশে। এ ছাড়া আবহাওয়া এত খারাপ যে শতকরা ৬০ ভাগ জমির ফসল ঠিকমত

উঠবে কিনা তা নিয়ে চিরকাল ঝুঁকি থেকে যায়। সেচের আওতায় আনা জমি পরিমাণ মাত্র শতকরা ৬'৫ ভাগ। এ জন্য অধিক খাদ্য ফলাবার এক ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। চারদিকে তারই পোসটার। টি ভি.-র ক্যামেরা চাষীর খামারে গিয়ে বার বার চাষের সমস্যাকে তুলে ধরছে।

খবরের কাগজের রিপোরটার ছুটোছুটি করছেন কালেকটিভ ফারমে। কাগজ সমালোচনায় মুখর। অমুক ফারমের উৎপাদন কম হল কেন? ভাল করে কাজকর্ম বোধহয় হচ্ছে না। টি. ভি-র রিপোরটার গিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করছে চাষীদের—এবার ফলন কি রকম হল? সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে না কেন?

আবার প্রশ্ন করি: কাজাখস্তানে কত লোকের টি. ভি. আছে?

: শতকরা ৯০ জনের।

: আচ্ছা রেডিও ও টি. ভি.-তে কি আপনারা প্রশাসনের সমালোচনা করতে পারেন?

: হ্যাঁ পারি। করা হয়ও। যেখানে সরকার ঘোষিত লক্ষ্য পূর্ণ করা যায় না সেখানে রেডিও ও টি. ভি. কঠোর।

সোভিয়েত রাষ্ট্রে উৎপাদন বৃদ্ধির চাবিকাঠি হল পরিকল্পিত অর্থনীতি। সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। পান থেকে চুন খসলেই মুশকিল। তা নিয়ে সমালোচনার অন্ত থাকে না।

উপমন্ত্রী আবার বললেন: কারাগাণ্ডা রাষ্ট্রীয় খামারের আলুর উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল বলে আমাদের পারটির একজন কর্তাব্যক্তি তা নিয়ে নিয়ে রেডিওতে তীব্র সমালোচনা করেন। আর কয়লাখনি উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি বলে তা নিয়ে একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা হয়েছিল। ওখানে সাজেশান দেওয়া হয় কিভাবে উৎপাদম বাড়ান যাবে।

রেডিও সম্পর্কে বললেন: রেডিওর তিনটি চ্যানেল। চ্যানেল। নং এক: শতকরা ৬০ ভাগ অনুষ্ঠান হয় কাজাখ ভাষায়। শতকরা

৪০ হয় রুশ ভাষায়। চ্যানেল নং দুই : কাজাখ ভাষায় ১২ ঘণ্টা ধরে খবর, তথ্য ও সঙ্গীত প্রচার করা হয়। তিন নং চ্যানেল কৃষি সম্পর্কে। দিনে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে কৃষিকথার আসর।

রেডিও উজবেক উইগুর ভাষায় প্রোগ্রাম করে। চীন থেকে বহু উইগুর কাজাখস্তানে এসে বাস করছেন। এ ছাড়া আট লক্ষ জারমান-ভাষী আছেন কাজাখস্তানে। তাঁদের জন্যও জারমান ভাষায় অনুষ্ঠান হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাদেশিক বেতার ও দূরদর্শন অটোনমি ভোগ করে থাকেন। একটি রাজ্য কমিটিই হল বেতার ও টি ভি-র নীতি নিয়ন্তা। এর চেয়ারম্যান রাজ্যের বেতার মন্ত্রী। কাজাখস্তানে ১৯টি বেতার কেন্দ্রের জন্য ১৯টি আঞ্চলিক কমিটি আছে। মাসে দুবার করে তাঁরা বৈঠকে বসেন। মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী দুজনেই পেশাদার লোক। উপমন্ত্রী একজন সাংবাদিক ছিলেন।

প্রশ্ন করলাম : বিভাগীয় প্রধানরা কি পারটির লোক ?

: না। তাঁরা সকলেই প্রফেশ্যনাল।

: শিল্পী যোগাড় করেন কিভাবে ?

: শিল্পীদের প্রত্যেকেরই অভিনয় স্কুল থেকে পাশ করতে হয়। তারা তারপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে এখানে আসে।

সোভিয়েত দেশে প্রশিক্ষণ ছাড়া কোথাও ঢুকবার উপায় নেই। জনারেলিসটদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। স্পেশ্যালিসটদের সংখ্যা বাড়ছে। রেস্তোরাঁয় কুক হতে চাও, ক্যাটারিং পড়, পাশ কর। নাপিত হতে চাও, তাও বিশেষ ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করতে হবে। সাংবাদিকতা পড়তে হয় পাঁচ বছর। তারপর খবরের কাগজে চাকরি। ঝাড়ুদার, জেনিটর প্রত্যেকেরই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকলে বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। কাজটিও ঠিকভাবে জানা যায়। যার কর্ম তার সাজে, অন্যে পরে লাঠি বাজে। এই সার সত্যটি ওখানে সবাই বুঝেছেন।

শুনলাম শিল্পীদের পারিশ্রমিক সাড়ে এগারো রুবল থেকে শুরু।

এটি একবারের অনুষ্ঠানের ফি, সরকার যাদের পিপলস আরটিসট বলে আখ্যা দেন তাদের ফি হল পঁচিশ রুবল।

রেডিও টি ভি-তে কোন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। ধর্ম আলোচনা হয় না। চারচ ও রাষ্ট্র পরস্পর থেকে বিযুক্ত। তাই সরকারী প্রচার যন্ত্রে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কাজের কথা বাদ দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গেলাম। বললাম : একটা জিনিস আমায় বলুন, আপনারা জানেন, আমরা কম্যুনিসট নই। আমাদের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীক ও রাজনৈতিক চিন্তা একেবারে আলাদা। বলতে পারেন আপনাদের সঙ্গে একেবারে বিপরীত। তবে তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক এত নিবিড় করার ইচ্ছা কেন ?

উপমন্ত্রী বললেন : দেখুন, আমরা ভারতবাসীকে মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করি। কম্যুনিসটরা তো আগে মানুষ। তাই মানুষের প্রতি তাদের সহজাত শ্রদ্ধা। আমরা মানবতার জন্যই লড়াই করে যাচ্ছি। আমরা কখনও মানুষকে মানুষ ও কম্যুনিসট এই দুভাগে ভাগে করি না। আর আমাদের দেশে সবাই কম্যুনিসট নয়। কম্যুনিসট ছাড়া বাকিরা যে সব খারাপ এটাও আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের ২৬ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৯০ লক্ষ পারটির সদস্য। সুপ্রীম সোভিয়েতে ও সরকারে অনেকে আছেন যারা পারটির সদস্য নন। শান্তি, মৈত্রী ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহযোগিতায় যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের প্রতি সোভিয়েত জনগণের বিশ্বাস আছে।

খুব আশ্চর্য লাগল তাঁর কথা শুনে কারণ এ জাতীয় কথা ভারতীয় কম্যুনিসটদের কাছ থেকে কোনদিন শুনিনি। সাংবাদিক হিসাবে আমার প্রতিজ্ঞা কোন রাজনৈতিক দলের কাছে নিজের ব্যক্তিসত্তা বিকিয়ে দেব না। সমদর্শী হব। যার ভাল দেখব প্রশংসা করব। ভাল না লাগলে নিন্দা করব। এর ফলে কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই আমার কলকে জোটেনি। কম্যুনিসটদের কাছে তো নয়ই এদেশে কম্যুনিসটদের অসহিষ্ণুতার বহু উদাহরণ আমার জানা। তাঁরা মনে করেন, যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিরুদ্ধে। জাবুমানিতে

একজন ঠিক এই কথাই মনে ভাবতেন।

আমার অনুরোধে উপমন্ত্রী আমাকে টি ভি স্টুডিও দেখাতে নিয়ে গেলেন। ইচ্ছে করলে যে কোন বেয়ারা দিয়ে পাশের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এমন তাঁর সৌজন্যবোধ নিজেই আমাকে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় নেমে আঙুল দিয়ে দেখালেন: ওই দেখুন আমাদের নতুন টেলিভিশন সেনটার তৈরি হচ্ছে। সুন্দর বাড়ি উঠছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি বসবে সেখানে। এখন পুরনো বাড়িতেই স্টুডিও। একেবারে নতুনটা দেখাতে পারলেখুশি হতাম। তবু যখন দেখতে চাইছেন তখন পুরনোটাই দেখাই।

মন্ত্রী স্বয়ং এসেছেন বলে খুব একটা চাঞ্চল্য জাগল না।

সেলামের ঘটাও দেখলাম না। আমাদের দেশে তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাঁরা তবু স্বর্গের। মর্ত্যের মানুষ দেবতার সংখ্যা আরও কয়েক কোটি। তাই পূজো দিতে দিতেই আমাদের জীবন যায়। আমার মনে পড়ে গেল ১৯৬০ সালের একটি ঘটনা। তখন ইংলনডে একদল সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘুরছি। লিভারপুলে একটি হোটেলে উঠেছি। কিছুক্ষণ পরেই হোটেলের একজন বয় এসে বলল: স্যার যদি এই ঘরটা আর আধঘণ্টা পরে অকুপাই করেন তাহলে ভাল হয়। আমাদের প্রাইম মিনিসটার আসছেন। তিনি এই ঘরে এসে একটু চেনজ করে আবার চলে যাবেন।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে লাউনজে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি সদলবলে গটগট করে হেঁটে গেলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এসেছেন বলে তা নিয়ে হোটেলে কোন চাঞ্চল্য নেই। শুধু লাউনজে যারা বসেছিলেন তাঁরা একটু তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার যে যার নিজের কথাবার্তায় মন দিলেন।

উপমন্ত্রী আমাকে নিয়ে টিভি ম্যানেজারের ঘরে গেলেন। ম্যানেজার সমীহ করে বসালেন।

বলুন, কি করতে পারি?

আপনাদের চাকরিতে আঞ্চলিক লোক বা মৃত্তিকার সন্তানদের চাকরি দেবার ব্যাপারে কোন আসন সংরক্ষণ করা আছে কি ?

: না। আমাদের দেশে কোন রিজারভেশনের ব্যবস্থা নেই। তার দরকারও হয় না। পাশ করে বেরুলেই চাকরি।

: কীভাবে স্টাফ নির্বাচন করেন ?

: একটা পরীক্ষা হয়। প্রার্থীদের কোন প্রোগ্রাম করতে দেওয়া হয়। কিছু লিখতে দেওয়া হয়। সিলেকশন বোরড আছে। তারাই খাতাপত্র দেখেন। ইনটারভিউ নেন।

: আপনি তো ম্যানেজার। আপনি সরাসরি কাউকে চাকরি দিতে পারেন ?

: শিল্পীদের ক্ষেত্রে পারি না। তবে কর্মীদের ক্ষেত্রে পারি।

: আপনাদের কোন প্রোগ্রাম সবচেয়ে পপুলার ?

: ওঃ, তা গোটা পাঁচেক হবে। যেমন এক নং ধরুন—তামাশা।

: তামাশা ?

: হ্যাঁ।

: আরে ভারতে উর্দুতে তো ওই একই নামে প্রোগ্রাম হয়।

পরে জানলাম মধ্য এশিয়ার বহু শব্দ উর্দুতে এসে গেছে। যেমন কিসমিস, পোলাও, কাবাব, তামাশা। এমন বহু শব্দ পাওয়া যাবে যা আমাদের দেশে চালু।

: তামাশা হল হাসির গান। এছাড়া গুড ইভনিং বলে একটি গানের প্রোগ্রাম আছে। চেরমিয়া বলে কাজাখ লোকগাথার উপর একটি অনুষ্ঠান আছে। আছে ঐকতান বা কনসারট। এছাড়া একটি অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানও বেশ জনপ্রিয়।

কাজাখ টি ভি বছরে ৩৫ হাজার চিঠি পান দর্শকদের কাছ থেকে। ভারত সম্পর্কে প্রায়ই প্রোগ্রাম থেকে। এই নেহরু পুরস্কার প্রাপ্ত কাজাখ লেখক আনোয়ার আলি মুজানভের একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে শীঘ্র। বিষয় : ভারত। টি ভি-র কল্যাণে ভারত সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু জানে।

স্টুডিওতে নতুন শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং চলছিল। স্টুডিও দেখে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ফিরে চললাম। যেতে যেতে আমার দোভাষিণী কাজাখ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আলমা আটাতে মুসলমানের সংখ্যা কত?

ভদ্রমহিলা বললেন: আমরা ধর্মের ভিত্তিতে কোন পরিসংখ্যান রাখি না। কে মুসলমান, কে মুসলমান নয় এটা ব্যক্তিগত বিষয়। সোভিয়েত দেশে কোথাও কার কি ধর্ম ঘোষণা করার দরকার পড়ে না। এরিখ বলল: ২০ বছর আগে আজারবাইজানে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে দাঙ্গা হয়ে গেছে। এখন আর হয় না। এখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে শাদি হচ্ছে। এথনিক সমস্যা বলে কিছু নেই।

আমি বললাম: আমি একটি মসজিদ দেখতে চাই। ওরা আমায় নিয়ে গেল একটি মসজিদে।

এই মসজিদে কোন মিনার বা গম্বুজ নেই। একটি বাংলা প্যাটারনের বড় হলঘর।

ভেতরে ঢুকলাম। রঙ করা হচ্ছে। মিস্ত্রি খাটছে। বৃদ্ধ ইমামের সঙ্গে কথা হল। বললেন: প্রতি শুক্রবার নামাজ হয়। কিছুদিন আগে ঈদ হয়ে গেল। নামাজের সময় এলে দেখতেন বাড়ি ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম: কোন বয়সের লোক বেশি করে মসজিদে আসে?

ইমাম বললেন: বয়স্করা। তরুণদের তেমন পাইনা।

মুসলমানরা যদি অন্য জাতিকে বিয়ে করে তাহলে আপত্তি করেন কি?

তিনি বললেন: না। যার যা ইচ্ছে করতে পারে। আমাদের আপত্তি করার কি আছে?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমানদের ধর্ম আচরণের অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তিগত আইন এদেশে অচল। অর্থাৎ কোন মুসলমান এক

স্ত্রী থাকতে একাধিক বিবাহ করতে পারে না। আইন সম্মতভাবে ছাড়া তালাকও দিতে পারে না। সংবিধানে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য একই আইন। কারও বিশেষ কোন অধিকার স্বীকৃত নয়। ধর্ম আচরণের যেমন স্বাধীনতা আছে তেমনি অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধেও গিরজা বা মসজিদ কোন শাস্তি দিতে পারে না।

সাধারণ স্কুলে ক্লাসিক্যাল ভাষা পড়াবারও ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসা ধরনের বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষার তো প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র মৌলবী ও মোল্লা ছাড়া পোশাকে আশাকে মুসলমান বলে কাউকে সনাক্ত করা কঠিন। তবে মেয়েরা জাতীয় পোশাকও পরে আবার আধুনিক জিনিস ও স্ল্যাকসও পরে। জাতীয় পোশাক বলতে শালোয়ার কামিজের মত পোশাক। পুরুষেরা মাথায় টুপি পরে। উজবেকিস্তানে এই টুপি আরও জনপ্রিয়। বাচ্চাদের মাথাতেও একটি করে টুপি। মেয়েদের বোরখা নেই। তবে গ্রামের মেয়েরা পর্দানসীন না হলেও বেশ লাজুক।

বিকেলবেলা আমার অ্যাপয়েনটমেনট ছিল শিক্ষা দফতরে। ওখানেও উচ্চশিক্ষা দফতরের উপমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিল। আমার জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল প্রধানত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে। কারণ আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার চেয়ে এই স্তরের সমস্যা বেশি। আর মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার চেয়েও জটিল।

প্রথম প্রশ্ন : শিক্ষক পেতে কোন অসুবিধা হয় কি না ?

উত্তর হল : না। কারণ আমরা প্ল্যান করি আগে থেকে। তবে একথা ঠিক শিক্ষকতার চেয়ে লোকে টেকনিক্যাল কাজকর্ম বেশি পছন্দ করে। এজন্য শিক্ষকদের জন্য কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিতে হয় বৈকি। যেমন ফ্ল্যাট বণ্টনের ব্যাপারে শিক্ষকেরা অগ্রাধিকার পান। যদি প্রাইভেট বাড়ি ভাড়া নিতে চায় তাহলে তার জন্য বাড়ি ভাড়া পান। তাদের বাড়ির হিটিং ব্যবস্থার খরচা শিক্ষা দফতরই বহন করে।

তবে দেখুন, শিক্ষকদের তো টাকার লোভ দেখিয়ে কেনা যায় না। শিক্ষকতা এক সম্মানীয় বৃত্তি। এই সম্মানের জন্য লোকে শিক্ষকতায়

আসেন। যদিও তুলনামূলকভাবে বেতন কম।

: কত বেতন ?

: মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকদের বেতন ১১০ রুবল প্রতি মাসে। অর্থাৎ চোদ্দশ টাকার মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ৫০০ রুবল। তবে বেতন নির্ভর করে কাজের ঘণ্টার ওপর।

: আপনাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা তো আবশ্যিক ও অবৈতনিক। কিন্তু সব ছেলেমেয়ে কি পুরো মাধ্যমিক পড়ে ? পড়াশুনোয় খারাপ ছেলেও তো থাকে। বয়স হয়ে গেলে তারা তখন তো পড়া ছেড়ে দিয়ে ড্রপ আউট হয়ে যেতে পারে। তাদের জন্য কি ব্যবস্থা আছে ?

: হ্যাঁ। এমন ড্রপ আউট হয়ও।

তাঁদের জন্য সান্ধ্য স্কুলের ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েতের বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে মোটামুটি পরিচয় দিলেন তিনি।

বয়স্ক শিক্ষা নিরক্ষরদের শিক্ষা নয়। ড্রপ আউটদের শিক্ষা। তারা কেউ বেকার নয়। সবাই কিছু না কিছু কাজ করে। ক্লাস হয় সন্ধ্যায় ও সকালে। সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যায় ক্লাস হয়। একদিন সকালে। কাজ কামাই করে ক্লাস করলে স্কুলই অর্ধেক মাইনে দিয়ে দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে একদিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে খুব মিল। সেটা হল ভাষা সমস্যা। ৩২টি ভাষায় সে দেশে শিক্ষা দেওয়া হয়। কে কোন ভাষায় শিক্ষা নেবে তা ছাত্রের অভিভাবকেরাই ঠিক করেন। এটি তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার। কোথাও ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন মাতৃভাষার মাধ্যমেই পড়ান হয়, কোথাও বা প্রাথমিক ক্লাসে প্রথম তিন বছর মাতৃভাষায় পড়িয়ে বাকিটা রুশ মাধ্যমে পড়ান হয়। কোথাও রুশ মাধ্যম শুরু হয় ক্লাশ ফাইভ থেকে।

এ ছাড়া আছে মিকসড স্কুল। যেখানে ১৫ থেকে ২০টি জাতির বহুভাষী ছেলেমেয়ে পড়ে। এই সব স্কুলে মাধ্যম কিন্তু রাশিয়ান।

ভারতবর্ষেও মিকসড স্কুলগুলিতে ইংরাজির মাধ্যমে পড়ান হয়ে

থাকে। যেহেতু রুশ ভাষার মত ভারতে হিন্দি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা হতে পারেনি সেহেতু ইংরাজিকে এই সব মিকসড স্কুলের জন্য মাধ্যম হিসাবে রেখে দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

ভারতবর্ষেও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আঞ্চলিক ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চাই একটি জাতীয় ভাষা। সেটি কোন ভাষা হবে? ইংরাজি না হিন্দি এটাই প্রশ্ন। ইংরাজি হটালে হিন্দিকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বলে চেঁচালে চলবে না।

আলমা আটাতে শতকরা ৫০ জনই রাশিয়ান। যেদিকে তাকাই রাশিয়ানদের চোখে পড়ে। সোভিয়েত দেশে রাশিয়ানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এককভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রাশিয়ানদেরই সংখ্যাধিক্য।

অনেক রিপাবলিকেই রুশয়া দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় জাতিগত গোষ্ঠী। এ কথা ঠিক রাশিয়ান রিপাবলিক এতদিন পর্যন্ত শিল্পে সবচেয়ে বেশি উন্নত ছিল। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের মত অবস্থা তার। সোভিয়েতের শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৬২ ভাগ সেখানে উৎপন্ন হয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নে রাশিয়ানদের আর সংখ্যাধিক্য থাকবে না। এর কারণ রাশিয়ানদের মধ্যে জন্মহার কমছে। অন্যান্য রিপাবলিকে বাড়ছে। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার প্রচণ্ড গতিতে বেড়ে চলেছে।

১৯৫৯ সালে রাশিয়ানরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৪·৬ ভাগ। এখন তাদের সংখ্যা ৫৩ ভাগ।

এরিখের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলল: রাশিয়ান মেয়েরা এখন একটির বেশি সন্তান চাইছে না। অধিক সন্তান মানেই আঁতুড় ঘরে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা। স্বাধীনতার পায়ে বেড়ি পরান।

রাষ্ট্র থেকে তিনটির বেশি সন্তান হলেই নানা সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক রাশিয়ান দম্পতিকে এ ব্যাপারে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। অন্য দিকে মুসলমান সোভিয়েতবাসীরা সন্তান উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এক একজনের অন্তত পাঁচ-ছটি করে ছেলেমেয়ে।

সাত-আট ন'টি ছেলেমেয়ের মাও আছেন। যৌথ খামারে তাজিক কৃষক পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বিবাহিত মেয়েরা খামারের কাজে বেশি লাগতে পারেন না। গৃহবধূ হয়েই থাকেন। কারণ সন্তান ধারণ করতে করতেই তাঁর যৌবন চলে যায়। নারীকে অধিক সন্তান ধারণ করার জন্য এই প্রলুব্ধ করা এটা অনেকের কাছে মধ্যযুগীয় বলে মনে হয়। কিছুতেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের চিন্তাধারার সঙ্গে মেলাতে পারা যায় না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা নারী এর ফলে ক্রমশ একটি উৎপাদন যন্ত্রে পরিণত হয়। যেন তাকে বলা হয় আমার দেশের কারখানার জন্য আরও শ্রমিক চাই, আমার ক্ষেতে ফসল ফলাবার জন্য আরও কৃষক চাই, তুমি তাই আরও কৃষক-শ্রমিক উৎপাদন কর। তার জন্য রাষ্ট্র তোমাকে নানা সুবিধা দেবে। কিন্তু সন্তান যদি ভালবাসার ফসল না হয়ে শুধু মাত্র জৈবিক তাড়না কিংবা যান্ত্রিক মিলনের ফলশ্রুতি হয়, তাহলে তার সুস্থ মানসিকতা কি করে গড়ে উঠবে। তাছাড়া অধিক সন্তান যে নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী সেটা তো আধুনিক রাশিয়ান দম্পতিরা নিজেরাই মেনে নিয়ে সমস্ত প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে এক বা দুই সন্তান নিয়েই সুখে রয়েছেন।

মধ্য এশিয়ার এর ফলে জন্মহার বাড়ছে। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ১১·৮ ভাগ। ১৯৭০ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৪ ভাগ। দুই হাজার সালে মুসলমানরা হবেন সোভিয়েত জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ। এ তথ্য. দিয়েছেন সোভিয়েত ডেমোগ্রাফার জি এ বোনডারসকি।

এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে আগামী দিনগুলিতে আর রাশিয়ানদের প্রাধান্য থাকবে না। তখন রাশিয়ায় অন্যান্য রিপাবলিকের লোকজনেরাও সমস্ত কাজে আরও বেশি আসবে। এই দশকে যত রাশিয়ান চাকরি থেকে অবসর নেবে তার চেয়ে কম রাশিয়ান কাজে যোগ দেবে। ১৮৯০ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে রাশিয়ান রিপাবলিকের কর্মরত ব্যক্তি জনসংখ্যা ৮ কোটি ৩৮ লক্ষ থেকে কমে ৮ কোটি ২৫ লক্ষে এসে দাঁড়াবে।

ইতিমধ্যেই রিপাবলিকগুলির দায়িত্বশীল বহু পদে স্থানীয় লোক কাজ করছেন।

আবার মধ্যশিক্ষার কথায় ফিরে আসি।

মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের মত ওদেশেও দশ বছরের। সাত বছরে একটি ছেলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়। সতের বছরে স্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক পাশ করে বেরোয়। কিনডারগারটেনে পড়ার সময় ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে দশ গুণতে পারলেই চলে যায়। এ ছাড়া তারা কিছু ছড়া মুখস্থ করে। নানা আঁকিবুকি কাটে। প্রাথমিক স্কুলের ওয়ান থেকে থ্রি-তে লিখতে ও পড়তে শেখান হয়। শেখান হয় ব্যাকরণ, গণিত, সঙ্গীত, আঁকা, ব্যায়াম। প্রথম তিন বছর একজন শিক্ষকই পড়ান। ক্লাস ফোর থেকে ইতিহাস আর বিদেশী ভাষা পড়ান শুরু হয়ে যায়। সব স্কুলে সব ভাষা থাকে না। বিদেশী ভাষার মধ্যে আছে ইংরাজী, জারমান, ফরাসি, স্প্যানিশ। কোন কোন স্কুলে একাধিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। ছাত্র যেটি পছন্দ করবে সেটি সে নেবে। এ বছর থেকেই এক একটি বিষয় পড়াতে শুরু করেন সাবজেকট টিচার। ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত ভূগোল আর ইতিহাস পড়তে হয়। ক্লাস সিকসে উঠলে ফিজিকস, আলজেব্রা ও জ্যামিতি। সাত ক্লাস থেকে কেমিসট্রি আর মেকানিকাল ড্রইং (তখন সাধারণ ড্রইং উঠে যায়)। একবছর পড়তে হয় অ্যাসট্রোনমি।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকে বটানি। ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে বটানির বদলে প্রাণীবিদ্যা বা জুওলজি। ক্লাস এইটে অ্যানাটমি।

নাইন টেনে জেনারেল বায়োলজি। সাহিত্য পড়া শুরু হয় ক্লাস ফোর থেকেই। চলে ক্লাস টেন পর্যন্ত। শেষ দু'বছর বিদেশী সাহিত্যও পড়তে হয়।

ক্লাস ফোর থেকে এইট পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ওয়ারক এডুকেশন নিতে হয়। এই ওয়ারক এডুকেশনে মেয়েরা নেয় রান্নাবান্না, সেলাই, ছেলেরা ইলেকট্রিক ও মেটালের কাজ। আগেই বলেছি মাধ্যমিক

শিক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নে আবশ্যিক কিন্তু তা বলে তো জোর করে কাউকে পড়ান যায় না। এ জন্য ক্লাস এইটের পর একটা পরীক্ষা দিয়ে ছেলেমেয়েদের ঠিক করতে হয় যে তাদের পড়াশোনা চালাবার মত মেধা আছে কিনা। তারা ইচ্ছে করলে তখন চাকরি-বাকরি নিয়ে সান্ধ্য স্কুলে ভর্তি হতে পারে অথবা ট্রেড স্কুলে ভর্তি হতে পারে। তবে শতকরা ৬০ জন ছেলেমেয়েই ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যায়।

কাজাখস্তানে শতকরা ৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করে। বাকিরা তার আগেই চাকরি-বাকরি করতে যায়। যে দেশে অত চাকরি খালি পড়ে আছে সে দেশে হাতের কাছে চাকরি পেলে পড়াশোনা ভাল লাগে না যাদের তারা কি আর রাত জেগে বই মুখস্থ করবে ? বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কলেজ আছে সোভিয়েত দেশে। এগুলোকে অনেকটা আমাদের দেশের পলিটেকনিক বলা যায়। এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকে আছে ২১৩টি বিষয়। তবে সব বিষয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ার আগ্রহ সমান নয়। কৃষি, ডাক্তারি, অর্থনীতি, ইলেকট্রনিকস পড়তেই ছেলেমেয়েদের বেশি ভিড়। তবে ইচ্ছে থাকলেই তো আর পড়া যায় না। ভর্তির যোগ্যতার মাপকাঠি বিচারের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়।

আমার প্রশ্ন ছিল নীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

উপমন্ত্রী বললেন : এথিকাল ও মর‍্যাল এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে।

মারকসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষা, দর্শন, নীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক কম্যুনিজম ক্লাসেই পড়ান হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : পশ্চিমী শিক্ষা থেকে সোভিয়েত শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

স্বাতন্ত্র্য বলতে আমি গুণগত প্রভেদের কথা বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার দোভাষী বোধহয় সেটা বোঝাতে পারল না।

উপমন্ত্রী বললেন : প্রথম তফাৎটা হল পশ্চিমী দেশে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি স্বতন্ত্র। এর ফলে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মানের ভীষণ তারতম্য ঘটে। কিন্তু আমাদের দেশে এমনটি হবার উপায় নেই।

আমাদের দেশে সর্বত্র শিক্ষার পাঠ্যসূচি এক। মানও সমান। দ্বিতীয় তফাৎটা হল পশ্চিমী দেশে শিক্ষা অবৈতনিক নয়। এখনে সমস্ত শিক্ষাই অববৈতনিক। এমনকি হসটেলে থাকার ব্যয় পর্যন্ত নামমাত্র। শিক্ষার জন্য স্টেট যেমন ব্যয় করে তেমনি ব্যয় করে বহু কারখানা এবং যৌথ খামার। তারা বহু বৃত্তি দিয়ে কর্মীদের ছেলে-মেয়েদের পড়তে পাঠায়। ১৯৫৫ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক। তবে হসটেলে খরচ লাগে। সেই খরচই দেয় যৌথ খামার আর কলকারখানা কর্তৃপক্ষ। একজন স্কুল ছাত্রের জন্য স্টেটের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ১৮০ রুবল। স্পেশ্যাল সেকেনডারি স্কুলে ছাত্র পিছু স্টেটের ব্যয় ৬৫০ রুবল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের জন্য ব্যয় হাজার রুবল। আমি বললাম: দেশের সব লোক শিক্ষিত, সচেতন। তবে প্রকৃত কম্যুনিসট সমাজ এখানও গড়ে তুলতে দেরি হচ্ছে কেন?

প্রকৃত কম্যুনিজম যে এখনও আসেনি সেকথা সব কম্যুনিসটই স্বীকার করেন। তাদের মতে এখন যা চলছে তা হল সমাজতন্ত্র। সাম্যবাদ আরও সূক্ষ্মতর জীবনবোধের ব্যাপার।

তখন স্টেটের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এমন একটা আদর্শ কল্পরাজ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে কম্যুনিসট শাস্ত্রে যার সঙ্গে ন্যায় নীতির যোগ ঘনিষ্ঠ। আমরা যে অধ্যাত্মবাদের কথা বলি সেও তো একধরনের জীবনবোধ যা এক সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার সঙ্গে কম্যুনিজমের সীমারেখা খুবই সূক্ষ্ম। আস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী নন এমন কেউ শুধু ন্যায় নীতি ও বিবেকবোধের দ্বারা চালিত হয়ে সমদর্শী সৎ দক্ষ এবং খাঁটি মানুষ হতে পারন কিনা। যদি প্রমাণিত হয় পারেন, তাহলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তা হবে এক বিরাট চ্যালেনজ।

আমার এই প্রশ্নটি উপমন্ত্রী সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। বললেন: আমাদের কাছে কম্যুনিসট সমাজ সফল কি ব্যর্থ সেটা বড় প্রশ্ন নয়।

বিদেশের লোকেরা যদি আমাদের প্রশংসা করে তাহলেই সেটি আমাদের সাফল্য বোঝাবে।

মধ্য এশিয়ার অশিক্ষিত ও অর্ধ যাযাবর বহু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের শিক্ষিত করে তোলা এক বিরাট কর্মকাণ্ড তাতে সন্দেহ নেই। ৬৫ বছর যে খুব একটা বেশি সময় নয় তা আমরা—ভারতবাসীরা বুঝতে পারছি। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও আমরা শতকরা ৬৫ জনের বেশি শিক্ষিত করে তুলতে পারিনি। সোভিয়েতের মত শতকরা একশ জনকে শিক্ষিত করে তুলতে আমাদের একশ বছর লেগে যাবে। অথচ বিপ্লবের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা অবস্থা ছিল স্বাধীনতার আগে তার চেয়ে ঢের ভাল অবস্থা ছিল আমাদের। ব্রিটিশ একটা শিক্ষার বনিয়াদ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার আগে বাংলার কথাই চিন্তা করা যাক না। পূর্ববাংলার বহু গ্রামে দশ বিশটা করে গ্রাজুয়েট পাওয়া যেত। আর গোটা কাজাখস্তানে বিপ্লবের আগে গ্রাজুয়েট ছিল মাত্র ২২ জন। শতকরা ২ জন লোক লিখতে পড়তে পারত। থিয়েটার, আরট, পেনটিং সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ছিল না সাধারণ মানুষের। ২৭ বছর ছিল মানুষের গড় আয়ু। এখন গড় আয়ু হয়েছে ৭১ বছর। শিল্প-স্থাপত্য-সাহিত্য সব দিক থেকে জোয়ার এসেছে দেশে। শিক্ষার হার শতকরা একশ ভাগ। সোভিয়েত জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজাখরা এখন সমান অংশ নিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় পারটি কমিটির প্রথম সচিব কুনায়েভ একজন কাজাখ। কাজাখস্তানে ১৯টি প্রশাসনিক জেলা আছে। তাদের মধ্যে ১৭টির প্রধান কাজাখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯ জন ডিনের মধ্যে ৪৫ জন কাজাখ।

কাজাখস্তানে এসে আর যে বিনোদনটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেটি সারকাস। সারকাস, ম্যাজিক প্রভৃতি আমার কাছে সিনেমা থিয়েটারের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। বিদেশে এর আকর্ষণ বরং বেশি। কারণ এগুলি বুঝতে আর ভাষা জানার দরকার হয় না। তাছাড়া সারকাসের মধ্যে আছে দীর্ঘ অনুশীলন। অসম্ভব রকমের

আন্তরিকতা। ফাঁকির কোন সুযোগ এই বৃত্তিতে নেই।

সোভিয়েতের লোকজন সারকাসের খুব ভক্ত। প্রায় প্রত্যেক শহরে স্থায়ী সারকাস হল রয়েছে। মসকোতে তো একাধিক সারকাস।

আলমা আটার সারকাস হলটি আয়তনে ছোট। তাও হাজার-খানেক লোক ধরে মনে হল। সন্ধ্যা সাতটায় শো। বাইরে প্রচণ্ড রোদ্দুর। ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে বহু লোক। বাচ্চারা হাতে সময় আছে দেখে সারকাসের সামনে ফোয়ারার জলে একটু সাঁতার কেটে নিচ্ছে।

সোভিয়েত সারকাস আমি একবার দেখেছিলাম লনডনে। সেটি সম্ভবত মসকো স্টেট সারকাস। কাজাখ সারকাসে অত জাঁকজমক নেই। তবে মন্দ লাগল না। বেশির ভাগ জিমন্যাসটিকের খেলা। চলন্ত ঘোড়ার ওপর থেকে লাফানো। একটি মেয়েকে একটি ছুটন্ত ঘোড়া থেকে আর একটি ঘোড়ায় তোলা এসব খুব বাহাদুরির খেলা। গ্রামাঞ্চলে এমন ক্যাচ দি গারল একটি জাতীয় লোকক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত। একসময় কাজাখরা ছিল যাযাবর জাতি। ঘোড়ায় করে মেষ চরাত। আমেরিকার কাউবয়দের মত ব্যাপার স্যাপার। সেই থেকে ঘোড়ার সঙ্গে ওদের সংস্কৃতির যোগ ঘটে গেছে।

একটি রাজ্য হিসাবে কাজখস্তানের যে সম্পদ আছে, রাজ্য হিসাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা সেসব কল্পনাও করতে ১৯২৯ সালে এই শহর কাজাখস্তানের রাজধানী হয়। ১৭ হাজার হেকটর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গারডেন সিটি। প্রধানত শিল্পনগরী। প্রায় ১১০টি শিল্প আছে আশেপাশে। ২০টি হোটেল। ২০০টি মাধ্যমিক স্কুল। ১৬টি হায়ার এডুকেশন ইনসটিটিউশন। অথচ শহর জীবনের কোন টেনসন নেই। জীবন চলছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে।

আজ ৪ আগস্ট কাজাখিস্তান লেখক সমিতির অফিসে এক বৈঠক ছিল। সেভিয়েত ইউনিয়নে লেখকেরা সংগঠনবদ্ধ। অন্যান্য দেশে লেখক লিখে চলেন মনের আনন্দে। লেখা তাঁদের কারও পেশা, কারও

নেশা। কিন্তু সৃজনাত্মক কাজকর্মকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিভিত্তিক ব্যাপার বলে মনে করা হয়। লেখক সংঘ বা সংগঠন বলে যা আছে তা পোশাকি লেখকদের সংগঠন। এদের মধ্যে থাকতে পারে সাংস্কৃতিক মনোপলি স্থাপনের প্রচেষ্টা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মত অমন শক্তিশালী লেখক সংগঠন অন্য দেশে আছে বলে জানি না।

আলমা আটাতে কাজাখ লেখক সমিতির বিরাট বাড়ি। ওই বাড়িতেই তাঁদের প্রকাশন বিভাগ। অফিসের সামনে ফুটপাথে তাঁদের প্রকাশিত বই বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতার ভিড়ও বেশ।

ঢোকার মুখে একজন কর্মী এসে অভ্যর্থনা জানালেন। নাম বললেন: আজাদ বেগ।

ওপরে কর্মকর্তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রায় দশ বারোজন বসেছিলেন। বড় টেবিলের দুপাশে। লেখক সমিতির ফার্স্ট সেকরেটারি মৌদা গালিয়ভ শুরু করলেন: হে ভারতের অতিথি, স্বাগত। ভারতের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা। আমি একবার ভারতে গিয়েছি। আমাদের বরেণ্য কাজাখ লেখক আনোয়ার আলি মুসানফ অনেকবার ভারতে গিয়েছেন। কবি শামকিয়ালভ ভারতে গিয়েছেন। তিনি আবার কাজাগ-ভারত সুহৃদ সমিতির সভাপতি। সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের লেখক সমিতিই সবচেয়ে বড়। ৪৩০ জন সদস্য। এ'দের মধ্যে ৩০০ জন কাজাখ লেখক। ৬০ জন রাশিয়ান, ৩০ জন উইগুর। বাকিরা জারমান ও কোরিয়ান। আমরা দুটো মাসিক পত্রিকা ও একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করি। এছাড়া তরুণ লেখকদের জন্য আছে দ্বিমাসিক পত্রিকা। আমরা ছাড়াও আলমা আটার বাইরে আরও ৫টি আঞ্চলিক লেখক সমিতি আছে।

পরিচয় হল সেকরেটারি মুরাদ বেখভের সঙ্গে। তিনি কাজাখ সাহিত্যের এক খ্যাতিমান লেখক। আর একজন লেখকের সঙ্গে আলাপ হল ভিলাখিন বিখোসিন। তিনি দৈনিক পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক। কবি আমাজন শাজ্জয়েলেভ প্রচার শাখার চেয়ারম্যান।

আলাপ পরিচয়ের শেষে ওরা জানতে চাইলেন : আমার কিছু প্রশ্ন আছে কি না।

আমি বললাম : আমার একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করে, কি করে আপনারা জাতীয় সংহতি ঘটিয়েছেন ? গালিয়ভ বললেন : আমাদের নানা জাতির কারও মধ্যেই বৈরীভাব নেই। ছোট এথনিক গ্রুপ বা বড় এথনিক গ্রুপ সকলেই মাতৃভূমির প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাছাড়া আমাদের সাহিত্য আমাদের জাতীয় সংহতির পথে প্রধান সহায়। এমন অনেক ভাষা আছে যা বলে মাত্র কয়েক হাজার লোক। কিন্তু সেই সব ভাষাতেও বিখ্যাত রুশ সাহিত্যের অনুবাদ হয় আবার তাঁদের লেখাও অন্য ভাষায় অনুবাদ হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম : লেখক সমিতির খরচ চলে কিভাবে ?

জানালেন : সরকারি অনুদান থেকেই প্রধান খরচ চলে। ওঁদের প্রকাশিত বই ও পত্রপত্রিকা থেকেও আয় হয়।

: কোন লেখক লেখক-ইউনিয়নের সদস্য না হয়েও কি লিখে যেতে পারেন ?

: পারেন। তবে প্রতিভাধর সব লেখকই লেখক সমিতির সদস্য। তাঁদের সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। অনেক লেখক আছেন যাঁরা আমাদের সদস্য না হয়েও বই প্রকাশ করেছেন। আমরা যাকে তাকে সদস্য করি না। অন্তত চার পাঁচটা বই না প্রকাশ করলে আমাদের সদস্য হওয়া যায় না।

: লেখকরা মারকসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শই সাহিত্যে রূপায়িত করেন এটাই কি প্রত্যাশিত ?

: যখন আমরা লিখি তখন আমাদের উদ্দেশ্য মারকসবাদ-লেনিন-বাদকে দেখান নয়। আমাদের জীবনের উন্নয়নকে দেখান। আমরা মনে করি বই হল মানব বিজ্ঞান।

: এমন কোন বই-এর নাম করতে পারেন কি যেখানে সমাজ ব্যবস্থাকে সমালোচনা করা হয়েছে ?

: আমাদের বইতে পজিটিভ হিরো ও নেগেটিভ হিরো দুই থাকে।

খারাপ-ভাল ত্বরকমের চরিত্রই থাকে। কথায় কথায় জানতে পারলাম একটু ভাল বই হলে এক সপ্তাহের মধ্যে এক একটা সংস্করণ শেষ হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে গোয়েন্দা গল্প এখন জনপ্রিয় হচ্ছে। তবে ভূতের গল্প বা অলৌকিক কাহিনী ছাপা নিষিদ্ধ। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, আব্বাস আহমেদ, কৃষ্ণাণ, সরদার জাহির, সুভাষ মুখোপাধ্যাযের বই কাজাখ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জাসুসি প্রিনটিং হাউস বছরে ১৫ থেকে ২০টি ভারতীয় বই অনুবাদ করে। উপন্যাস প্রথম সংস্করণ ৩০ হাজার ছাপা হয়। বিক্রি হয় এক লক্ষ কপি। কবিতা ছাপা হয় প্রতি সংস্করণ ৫ থেকে ১০ হাজার। ভাল কবিতা বই-এর বিক্রি ৩০ হাজার। বিখ্যাত কাজাখ কবি অলজাস সুলেমিয়ানভের কবিতার বই ত্বটি সংস্করণে এক লক্ষ করে ছাপা হয়েছে। লেখক সঙ্ঘের 'জলতুস' মাসিক পত্রিকাটি এক লক্ষ সত্তর হাজার কপি বিক্রি হয়।

প্রত্যেক কাজাখ পরিবারেই নিজস্ব লাইব্রেরি আছে। কবিতার বই-এর দাম ৬০ কোপের থেকে ৮০ কোপেক। উপন্যাসের দাম এক থেকে তিন রুবল। প্রত্যেকটি বই-এর কাগজ বাঁধাই ও ছাপা প্রথম শ্রেণীর। যাঁরা সোভিয়েতে ছাপা বই দেখেছেন তাঁরা কিছুটা গুণগত মানের পরিচয় পাবেন।

এবার আমার প্রশ্ন: লেখকেরা কি সোভিয়েত ইউনিয়নে বেশি সুযোগ সুবিধা পান?

উত্তর পেলাম: হ্যাঁ পান। সাধারণ লোকের জন্য যেখানে মাথা পিছু ৯ বর্গ মিটার করে বাসস্থান বরাদ্দ, সেখানে লেখকদের জন্য বরাদ্দ ২০ বর্গ মিটার। তিনি ইচ্ছা করলে লেখার মালমশলা সংগ্রহের জন্য দেশের যেখানে যখন খুশি যেতে পারেন এবং তাঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্র থেকে করা হয়।

একে 'ক্রিয়েটিভ ট্যুর' বলা হয়। Creative Tour-এ গেলে একজন লেখক তাঁর চাকরিতে প্রতিদিন যে বেতন পান তার দ্বিগুণ টাকা

ভাতা হিসাবে পান। লেখক সমিতিকে সরকার থেকে বরাদ্দ করা ফ্ল্যাট আছে। সদস্যদের মধ্যে তা বণ্টন করা হয়। সমিতি লেখকদের জন্য বিভিন্ন শহরে বিশ্রামাগার তৈরি করবেন। তাঁরা হ'সপাতাল ও পলিক্লিনিক তৈরি করেছেন। সেখানে সমিতির সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আছে।

লেখকদের মধ্যে মুরাদ বেখভকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি ধরনের লেখা লেখেন ?

মুরাদের বয়স চারের ঘরে হবে। বেশ সপ্রতিভ চেহারা।

জবাব দিলেন ঃ আমি যৌথ খামারের চাষীর ছেলে। ভাই বোনেদের মধ্যে আমিই বড়। আমরা সাত ভাই। মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা চুকিয়ে আমি যৌথ খামারে চাষবাসের কাজে নেমে যাই। ওই সময় করেসপনডেনস কোরসের মাধ্যমে পড়াশোনা চলতে থাকে। তারপর স্থানীয় পত্রিকায় কাজ নিই। এরপর চলে যাই আঞ্চলিক খবরের কাগজে। সেখান থেকে উরতুজ পত্রিকায় চাকরি পাই। ১৯৫৭ সালে আমার প্রথম লেখা বার হয়। তখন আমার বয়স ১৮ বছর। আঞ্চলিক কাগজে লেখাটি বেরিয়েছিল। একটি গল্প। নাম হল মিটিং। গ্রামের পটভূমিকায় লেখা। আমি মনে করি একজন লেখকের উচিত তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে না যাওয়া। যা তিনি দেখেছেন, যা জানেন, তাই তিনি লিখবেন। আমি মেষপালকদের নিয়ে অনেক লেখা লিখেছি। কারণ আমি ওদের ভাল করে জানি। ১৯৫৭ থেকে আজ পর্যন্ত ১৫টি উপন্যাস লিখেছি। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে 'অরণ্যের আপেল গাছ'। এটি আমার কালের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যাদের যৌবন অতিবাহিত হয়েছে তাদের জীবনযন্ত্রণার কথা। জানেন, সাত বছর বয়সে আমাকে রোজগারের জন্য বেরুতে হয়েছিল। কারণ দাদারা সবাই যুদ্ধে। বাড়িতে পড়ে বাবা-মা দাদামশাই দিদিমা। কাজ করার কেউ নেই। আমার মত শিশুদেরই তাই কাজে নামতে হয়েছিল। এটাই আমাদের জেনারেশনের টিপিক্যাল স্টোরি। আমার মূল বইটি লেখা কাজাখ ভাষায়। রুশ

ভাষাতেও বইটির দুটি সংস্করণ হয়েছে। জার্মান প্রজাতন্ত্রেও বইটির ভাষান্তর প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন করি: একজন লেখক হিসাবে আপনাদের সমালোচনা করার মত এমন কোন বিষয় আছে?

মুরাদ একটু থেমে বললেন: এখন সমস্যা হচ্ছে খাদ্যের। গ্রামে গিয়ে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানর কথাই এখন জাতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাঁরা ঠিকমত কাজ করছেন না আমি তাঁদের সমালোচনা করি। গ্রামে গিয়ে চাষীদের বলি, কোন্‌টা ঠিক হচ্ছে না। কোথায় ভুল হচ্ছে। গ্রামের সঙ্গে আমার গভীর যোগ আছে।

এবার আমি প্রশ্নের সূত্র পেয়ে যাই। বলি: কেন এই খাদ্য সমস্যা বলুন তো?

মুরাদ যা বললেন তা একটু অন্য সুরের কথা। সরকারি লাইনের কথা নয়।

বললেন: খাদ্য সমস্যার জন্য দায়ী মানুষ। অনেকে কঠোর শ্রম করতে চায় না। এদিকে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে। লোকের চাহিদা বাড়ছে। আমার মা-ভাই এখনও যৌথ খামারের কাজ করে। আমি গ্রামকে ভাল করে চিনি। আমার উপন্যাসে এই সব কথাই লিখেছি।

: রোমানটিক কবিতা লেখাকে কি এক ধরনের এসকেপিজম বলে মনে করেন?

: আমাদের কবিরা শুধু রোম্যানটিক কবিতা লেখেন না। তাঁরা কসমস, নাগরিক জীবন সৌন্দর্যানুভূতি সব কিছু নিয়েই লেখেন। যেমন তুমান বাই, মোনদা গালিভ, আবদিন দা তাজি বায়েভ এরা যেমন রোম্যানটিক কবিতা লেখেন তেমনি সোভিয়েত জীবন নিয়েও লেখেন।

: এখনকার সোভিয়েত যুবকদের জীবন, জীবনবোধ কী ধরনের?

মুরাদ বললেন: রোম্যানটিসিজম শুধু প্রেমে নয়, জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে তা প্রতিফলিত একথা তরুণেরা বোঝেন। গত ৫০ দশকে

আমাদের ক্যামপেন ছিল সেলিনা অর্থাৎ পতিত জমি উদ্ধার কর। সেই ডাকে তরুণেরা সাড়া দেয়। ১৯৬০-৭০ সালে নতুন কনসট্রাকশনের কাজে বহু তরুণ এগিয়ে আসেন। তরুণ কম্যুনিসট লিগের সদস্যরা (কমসোমল) সারা সোভিয়েত দেশ থেকে এসেছিলেন কাজাখিস্তানে নির্মাণ কাজে অংশ নিতে।

এবার একটি অপ্রিয় প্রশ্ন করি। বলি ঃ পাস্তারনেক সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি ?

উত্তর আসে ঃ তাঁর কবিতা দারুণ। নিঃসন্দেহে তিনি এক প্রতিভাধর কবি। ভলাদিমার মাইকোপসকির সময় থেকেই তাঁর প্রতিভা বিদিত। আমরা তাঁর কবিতা ভালবাসি। কিন্তু তাঁর কবিতায় অনেক দুর্বলতা আছে। আমাদের সমালোচকরা যখন তাঁর দুর্বলতার দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তখন তিনি পশ্চিমী দেশে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলেন। মুরাদ ডঃ জিভাগো পড়েননি। তবে অন্য বইগুলি পড়েছেন। তাঁর অন্যান্য কবিতা শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত কবিতার নিদর্শন।

সালঝেনিৎসিন সম্পর্কে কথা তুললাম।

বললেন ঃ উনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কতগুলি চিঠি লিখেছিলেন যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায়। সেনসর তাঁর চিঠিগুলি ধরে ফেললে তিনি পালিয়ে যেতে চান। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর জেল হয়। তিনি বরাবর আমাদের দেশের ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে এসেছেন।

আলোচনাকে আর ভারি হতে দিলাম না। তাছাড়া এমন একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা চক্রে সরকারি ভাষ্যের বাইরে খুব অন্তরঙ্গ অভিমত কিছু জানাও সম্ভব নয়।

গতকাল রাতে হোটেলে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বেশ গরম। হোটেলের বারান্দার দরজা খুলে দিয়েছিলাম। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে মানুষের মমতা আর প্রত্যাশা দিয়ে গড়া একটি শহর ঘুমোচ্ছে।

রাত বারোটার পরেই রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। অসংখ্য সবুজ গাছ অন্ধকারে অতিকায় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আরও দূরে দুরন্ত হিমবাহকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের বিজয় তোরণের ছবিটি বার বার চোখের সামনে ভাসছিল। আমি কবিতা লিখি না। কঠোর গদ্য নিয়েই আমার কাজ কারবার। কিন্তু সে রাতে এক অদ্ভুত বিষাদে মনটা ভরে উঠল। বিষাদ আমার দেশ ও তার মানুষের জন্য। কোথায় পড়ে আছি আমরা। সংকল্পের কোন দৃঢ়তা নেই, কর্তব্যের কোন আন্তরিকতা নেই। মনে হল, এখানে এসে মানুষের প্রবল ইচ্ছাশক্তির যে বিজয় ঘোষণা দেখলাম তাকে বর্ণনা করতে পারি একমাত্র কবিতায়। লিখে ফেললাম একটি কবিতা।

মেঘটাকে একটু সরিয়ে দাও
আমার চোখে মুখে সকালের
রোদ এসে লাগুক।

কবিতাটি লিখে ভাবলাম কাল সকালে যখন লেখকদের কাছে যাব তখন উপহার দেব। তাই একটি ইংরাজি তর্জমাও করে রেখেছিলাম।

আমি মুরাদকে বললাম: যদি অনুমতি করেন, একটি কবিতা আপনাদের জন্য লিখেছি। সেটি উপহার দেব।

মুরাদ বললেন: এর চেয়ে ভাল উপহার আর কি হতে পারে। আমরা আমাদের পত্রিকায় কাজাখ ভাষায় অনুবাদ করে কবিতাটি ছাপব।

সোভিয়েত পুস্তক প্রকাশনা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া গেল আবাই প্রসপেকটে কাজাখ প্রকাশক সমিতির অফিসে। সোভিয়েত রাশিয়ার বই প্রকাশনা ভারি শিল্পের মতই এক বৃহৎ কর্মকাণ্ড। প্রকাশক সমিতির অফিসটি একটি বহুতল বিশিষ্ট বাড়ির একটি ফ্লোর জুড়ে। ওই বাড়িতেই সাতটি প্রকাশক সংস্থার অফিস। বাড়িটির নাম তাই প্রকাশ ভবন—হাউস অফ পাবলিশারস। এঁদের

একটি প্রকাশন সংস্থা কাজাখস্তান পাবলিশারস-এর অফিসে গিয়েছিলাম। বিরাট ঘরে লেনিনের ছবির নিচে বসে সিজদিকভ কথা বলছিলেন। প্রথামত টেবিলে সাজান মিনারেল ওয়াটার আর আপেল। কাজাখস্তান পাবলিশারস রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করেন। এছাড়া ডাক্তারি ও আইনের বইও ছাপেন। কাজাখ. রুশ, জারমান ও উইগুর ভাষায় বই প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ক্লাসিক্যাল লেখকদের গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করেছেন, যেমন লেনিনের রচনাবলী তাঁরা কাজাখ ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

প্রকাশ করেছেন মারকস ও এঙ্গেলসের বই। বছরে ২০০ থেকে ২৫০ বই প্রকাশ করেন এই প্রকাশক সংস্থা। ছাপা হয় ৩০ লক্ষ কপি।

সোভিয়েত রাশিয়ার সব প্রকাশন সংস্থাই হয় সরকারি না হয় আধা সরকারি। এটি সরকারি সংস্থা। কিন্তু কম দামে এত ভাল বই দিয়েও তাঁরা লাভ করে থাকেন।

কাজাখস্তান প্রকাশক সমিতির চেয়ারম্যান এখন ইয়েলো উয়াকানভ। সোভিয়েত দেশে এসে সর্বত্র শুনছি 'স্পেশ্যালিসট'। বিশেষজ্ঞ ছাড়া কোথাও পাত্তা পাওয়া মুশকিল। উয়াকানভ প্রকাশক বিশেষজ্ঞ। সাংবাদিকতার গ্রাজুয়েট। অ্যাকাডেমিক শিক্ষাদীক্ষায় তিনি একজন শব্দতত্ত্বের লোক।

সোভিয়েত প্রকাশকেরা নিজেরা বই বিক্রির দায়দায়িত্ব নেন না। কাজাখ বুকস বলে সেলিং অথরিটি আছে তাঁরাই বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বই বিক্রির জন্য পাঠান হয়। বই বিক্রি কোন সমস্যাই নয় একথা সবাই বললেন। আমাদের দেশের মত বই ছেপে প্রকাশকদের দেনার দায়ে পড়তে হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বই প্রকাশ করতে হলে লেখক সমিতির সদস্য হওয়া আবশ্যিক কি না। ওঁরা বললেন, না তা নয়।

প্রযুক্তিবিদ হবার জন্য আমাদের দেশের মত ওদেশেও ছেলেমেয়েদের আগ্রহ অনেক বেশি। আলমা আটার পলিটেকনিকে এসে জানলাম এখানে বছরে ১৬০০ ছাত্র ভর্তি হয়। আবেদন পড়ে চার হাজারের মত। অ্যাডমিশন টেসট দিয়ে ছেলে ভর্তি হয়। আমি যখন গেলাম তখন ওঁদের অ্যাডমিশন টেসট চলছে।

পলিটেকনিক অর্থে ইনজিনিয়ারিং কলেজ। রেকটরের ঘরে বসে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন: ১৯৫৪ সালে আমাদের এই পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাইনিং, জিওলজি ও মেটালারজি নিয়ে প্রথমে ইনসটিটিউট তৈরি হয়। এযাবৎ ৩২ হাজার স্পেশ্যালিসট পাশ করে বেরিয়েছে ৩৫টি বিষয়ে। দিনে রাতে দুটো শিফটে ও করেসপনডেনস কোরস মিলিয়ে ১২ হাজার ছাত্র। ৯০০ অধ্যাপক। ৮০০ গবেষণাকর্মী। সে এক এলাহি ব্যাপার।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্পের যোগ নিবিড়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণার জন্য বছরে ৬০ লক্ষ রুবল অনুদান দেয়। তবে এই টাকা নিয়ে গবেষণার নামে ছেলেখেলা করা যাবে না। গবেষণার ফল এমন হওয়া চাই যাতে শিল্পগুলি উপকৃত হবে। এক রুবল পেয়ে, দু রুবল ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁদের। কাজেই শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপকার দুজনেরই। ওই ৬০ লক্ষ রুবলের শতকরা ৪০ ভাগ যায় বেতন ও বৃত্তি দিতে। বাকি টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি কেনা হয়। কিছু উদ্বৃত্ত টাকা আবার সরকারি তহবিলেও জমা পড়ে। পলিটেকনিকে ৬৯০০ ছাত্র গবেষণার সঙ্গে জড়িত। রেকটর সাহেব বললেন: প্রথম বছর থেকেই ছাত্রদের গবেষণার কাজে লাগান হয়। 'নটি শাখা গবেষণাগার আছে. এগুলিতে সরকার অনুদান দেন। তবে পলিটেকনিক নিজেও আয় করে। যেমন স্টুডেনটস কনসট্রাকশন ব্যুরোতে ছেলেমেয়েরা নানা যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য সরকার থেকে অরডার পায়।

পলিটেকনিকে ঢুকতে গেলে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে অ্যাডমিশন টেসট দিতে হয়। গণিত ও রুশ ভাষায় মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা

দিতে হয়। আর ফিজিকস, কেমিসট্রিতে মৌখিক পরীক্ষা হয়। রুশভাষা জানা আবশ্যিক।

চাকরি নিয়ে কোন চিন্তাই নেই। পলিটেকনিকের মধ্যেই লেবর মিনিসট্রির একটি অফিস আছে। তাঁরা কোথায় চাকরি খালি আছে তার সন্ধান দেন।

পলিটেকনিকের আসন সংখ্যা নির্ভর করে যোজনার ওপর। যোজনাবিদরা বলে দেন কত প্রযুক্তিবিদ লাগবে আগামী বছরগুলিতে।

আমাদের দেশে গ্রামে ডাক্তার ইনজিনিয়র যেতে চায় না। তাই প্রশ্ন করলাম কাজাখ ইনজিনিয়রদের গ্রামে পাঠাতে অসুবিধা হয় কিনা।

রেকটর বললেন : আমাদের দেশে ইনজিনিয়রদের ২ বছর গ্রামে কাজ করা বাধ্যতামূলক। অথবা বলা যেতে পারে তাকে যেখানে পাঠান হবে সেখানে সে দুবছর কাজ করতে বাধ্য। দুবছর পরে সে চলে আসতে পারে।

দূরে চাকরিতে গেলে কর্তৃপক্ষ তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য। দু' বছর বাইরে কাজ করার পর পোসট গ্র্যাজুয়েট করার সে সুযোগ পায়। এর জন্য বিশেষ স্কলারশিপ দেওয়া হয় তাকে। আমার জিজ্ঞাসা ছিল : আপনাদের দেশে ইনজিনিয়রদের ঘাটতি আছে ?

: হ্যাঁ আছে। মেটালারজি মাইনিং ও তেল শিল্পে ইনজিনিয়র চাহিদার তুলনায় কম।

: সিট বাড়াচ্ছেন না কেন ?

: এ বাড়িতে আর জায়গা নেই। নতুন বাড়ি তৈরি না করলে আর হবে না।

: বেশির ভাগ ছাত্ররা কি ইনজিনিয়ারিং পড়া পছন্দ করে ?

: এটা বলা শক্ত। তবে প্রতিবছর আমাদের ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। আর ইনজিনিয়রদের বেতনও অন্য চাকরির চেয়ে বেশি। কাজেই এর একটা বড় আকর্ষণ তো আছেই।

: মেয়েদের সংখ্যা কিরকম ?

: শতকরা ৩৫ জনই মেয়ে।

আগস্ট শেষ রাতে এসে পৌঁছলাম দুষাণ বে শহরে। তাজিকিস্তানের রাজধানী দুষাণ বে। কাজাখস্তান যেমন চীন সীমান্তে তেমনি তাজিকিস্তান আফগানিস্তান সীমান্তে। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ছিল তাজিকিস্তান উজবেক রিপাবলিকের মধ্যে। ১৯২৯ সালের ১৬ অকটোবর এটি আলাদা রিপাবলিক বলে স্বীকৃত হয়।

জনসংখ্যা ৩৮ লক্ষের মত। এই রিপাবলিকে বাস করেন তাজিক, উজবেক, কিরঘিজ, রাশিয়ান আর ইউক্রেনাইনরা। সংখ্যাগুরু হলেন তাজিকভাষীরা। ১ লক্ষ ৪৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার এই রিপাবলিকের আয়তন।

তাজিকিস্তানের সভ্যতা প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধিময়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, খ্রীস্ট-জন্মের ৪০০ বছর আগে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন তাজিকিস্তানে এসেছিলেন তখন তিনি সেখানে পরিপূর্ণ সভ্যতার বিকাশ দেখে অবাক হয়ে যান। সপ্তম ও অষ্টম শতকে মধ্য এশিয়া ছিল আরবদের অধিকারে। ৮৭৪ সালে প্রথম তাজিকিস্তান স্বতন্ত্র রাজ্যের পত্তন হয়। তখন এর রাজ্য-সীমা বিস্তৃত ছিল পারস্য সাগর পর্যন্ত। আর একদিকে ভারত সীমান্ত থেকে বাগদাদ পর্যন্ত। সেই দিক থেকে তাজিকিস্তান ছিল একদা ভারতবর্ষের প্রতিবেশী। তাজিক-ভারত সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব নিয়ে যে কোন ঐতিহাসিক গবেষণা করতে পারেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম তাজিক রাজ্যের দরবারী ভাষা ছিল পারসিক। তাজিক্-পারসিক সাহিত্য বলে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে ওঠে সে সময়। যার পথপ্রদর্শক ছিলেন আবু আবদুল্লা রুদাকি। এই ভাষাতেই অমর কাব্য শাহনামা লিখে যান ফিরদৌসি।

১৮৮৯ সালের মধ্যে তাজিকরা রাজ্যচ্যুত হয়। উত্তর ভাগ চলে যায় তারকেস্তানের শাসনে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগ যায় বোখারা এমিরেটের অধীনে। বোখারা এমিরেট ছিল রুশ জারের অধীন। জার ও স্থানীয় প্রশাসকের অত্যাচারে জর্জরিত এক পরাধীন জাতির ক্রন্দন সেদিন পামির উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হত। জার শাসিত সোভিয়েত

রাশিয়ার সবচেয়ে অনগ্রসর দেশ ছিল তাজিকিস্তান। কয়েকটি আদিম কয়লা খনি আর ছোট একটি তৈলখনি (৩০০ লোক কাজ করত সেখানে) ছাড়া আর কোন শিল্প ছিল না সেখানে। অধিকাংশ লোকই ছিল নিরক্ষর। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে তাজিকিস্তানের উত্তর অংশে ও পামির অঞ্চলে সোভিয়েতের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলেও বুখারা এমিরেটের শাসনাধীন অঞ্চলে এত সহজে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেখানে গণ আন্দোলন চলে। বিপ্লবীরা শাসন ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র সমস্যা। তখন সোভিয়েত সরকারের সাহায্য নিয়ে এই অচলাবস্থা দূর হয়। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার মধ্য এশিয়াকে ভাগ করে তাজাক অটোনমাস সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের পত্তন ঘটায়। আরও পরে ১৯২৯ সালের ১৬ অকটোবর সার্বভৌম তাজিক রিপাবলিকের জন্ম হয়।

তাজিকিস্তানের যা কিছু উন্নতি তা ঘটেছে ১৯২৯ সালের পর। প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওই বছর ২৫টি ছাত্র নিয়ে। আজ তাজিকিস্তানের তিন হাজার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দশ লক্ষের মত। ১৯৩০ সালে আসে প্রথম ট্রাকটর। আজ সারা রাজ্যের খামারগুলিতে রয়েছে ২৮ হাজার ট্রাকটর, ৩ হাজার কটন পিকিং মেশিন। ১৯৩২ সালে প্রথম শিল্পটির পত্তন হয়। সেটি একটি সিলক তৈরির কারখানা।

আজ এই রাজ্যে ৩৮৫টি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৩৩ সালের আগে কোন থিয়েটার ছিল না তাজিকিস্তানে, আজ ১১টি পেশাদার মঞ্চ সেখানে। ১২২৮টি প্যালেসেস অব কালচার অর্থাৎ সাংস্কৃতিক কলামন্দির। যেখানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ১৯৩৫ সালের আগে কোন শিক্ষক শিক্ষণ স্কুল ছিল না সেদেশে। আজ সেখানে ৪৮টি টিচারস ট্রেনিং ইনসটিটিউট। ১৯৩৭ সালের আগে গোটা রিপাবলিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হত না। ওই বছর দুশানবে শহরের জন্য দুটি টারবাইন দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা

হয় প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৫৭৫ কিলোওয়াট। ১৯৭৬ সালের হিসাবে তাজিকিস্তানে ১৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বছরে উৎপাদন এখন ১৫০ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা। এমনকি তাজিকিস্তানের প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আরও পরের ঘটনা—১৯৪৮ সালে। এত পরিসংখ্যান দেওয়ার এটাই উদ্দেশ্য যে মধ্য-এশিয়ার দুটি রিপাবলিক ভ্রমণ করে আমি কৃতনিশ্চয় হয়েছি যে যদি কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত না হত তাহলে এই রাজ্যগুলির অবস্থা আজ হত তথাকথিত ইসলামিক রাজ্যগুলির মত। নানাবিধ সংস্কারে আচ্ছন্ন এমন এক দেশ যেখানে কিছু ধনী ব্যবসায়ী ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভু ধর্মের কথা বলে মেয়েদের ঢুকিয়ে রাখত পর্দার আড়ালে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকত হয় ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজার হাতে না হয় রক্তস্রোত ঠেলে ক্ষমতায় আসা কোন সামরিক প্রশাসকের হাতে।

দুষাণ বের সঙ্গে আলমা আটার তফাৎ হল প্রচণ্ড আধুনিকতার মধ্যেও দুষাণ বের প্রাচীন চরিত্র অক্ষুণ্ণ আছে। প্রাচীন চরিত্র বলতে আমি তেহরান, কায়রো বা বেইরুটে যা দেখেছি তা নয়। দুষাণ বের যা কিছু নির্মাণ কাজ তা ১৯২৯ সালের পর থেকে। তবে আলমা আটার মত সবই নতুন স্থাপত্যরীতি নয়। তাছাড়া বহুতল বাড়ির সংখ্যাও কম।

প্রতিটি বাড়ির স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামিক প্রভাব চোখে পড়ে। ইসলামি সংস্কৃতির বন্ধন এখানে আরও দৃঢ়। যেমন তাজিক পুরুষ ও শিশুরাও মাথায় টুপি পরে। মেয়েরা পরে জাতীয় পোশাক। একসময় ওরা পারসিক লিপি গ্রহণ করেছিল তবে এখন আবার রুশ লিপিতে ফিরে গেছে। লোকজনের চেহারার মধ্যে পশ্চিম ভারতের অধিবাসীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত। ফর্সা রঙ। কালো চুল। স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল চেহারা।

দুষাণ বে এখন রীতিমত শিল্প শহর। আলমা আটার মতই সবুজ

গাছে ঢাকা। রাস্তার দু'পাশে গাছ। তার মাঝে আবার পায়ে চলা পথ। ফুটপাথ নেই। রাস্তার পাশ দিয়ে খোলা ড্রেন আছে। রাস্তা শুধু গাড়ি চলবার জন্য। পাবলিক ট্রানসপোরট বাস আর ট্রলি বাস। ট্যাকসি আছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম। ঝকঝক তকতক করছে পথঘাট। কোথাও এক টুকরো কাগজ পড়ে নেই। শেষ রাতে যখন শহরে ঢুকছিলাম তখন ঝাড়ুদাররা শহরটাকে ফিটফাট করে সকালের জন্য তৈরি করছিল।

তুষাণ বেতে আমার প্রোগ্রাম ছিল শিক্ষা দফতর ও স্থানীয় সংবাদ-পত্র অফিস পরিদর্শন। ভারত-তাজিক মৈত্রী সমিতির অফিসে যাবারও আমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কর্মসূচি ছিল যৌথ খামার পরিদর্শনের।

৬ মে ১৯২১ তাজিকিস্থানের রাজধানী তুষাণ-বে থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে সুরভ কিসনাকে আমরা যৌথ খামার দেখতে গেলাম। কিসনাক কথাটির অর্থ হল গ্রাম। ওই গ্রামে যৌথ খামারের অফিস। খামারের নাম উয়াস দানফ। সোভিয়েতের একজন বিশিষ্ট নেতার নামে। চার বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন এসেছিলাম তখন মসকোর কাছে একটি রাষ্ট্রীয় খামার দেখেছিলাম। যৌথ খামার দেখলাম এই প্রথম।

রাষ্ট্রীয় খামারের সঙ্গে যৌথ খামারের তফাৎ হল এখন যে জমি চাষীরা চাষ করছে একদা এগুলিই তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল। এখন ব্যক্তিগত মালিকানা আর নেই। তার বদলে, সমাজই জমির মালিক। যা কিছু উৎপাদন তা যৌথ শ্রমেরই ফলশ্রুতি। এছাড়া খামারের সদস্য চাষীরা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ০'২০ হেকটর করে জমি আছে। এদিক থেকে তারা কেউ ভূমিহীন নয়, আবার আগের মত জোতদারও কেউ নেই।

রাষ্ট্রীয় খামারে চাষীরা খামারের বেতনভুক কর্মী। আমাদের দেশে 'ব্লক ডেমনসট্রেশন ফারম যেমন তেমনি।

যৌথ খামার নিয়ে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমী দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক দেশের জবরদস্তি সম্পর্কে প্রচারের এটা একটা বড় হাতিয়ার। সোভিয়েত দেশে বিপ্লবের আগে জমি ছিল জমিদারদের হাতে। ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাদারদের ওপর জমিদারদের শোষণ যে কত প্রকট তা আর কেউ না বুঝুক আমরা ভারতবাসীরা বুঝি। তাই জমির ব্যক্তি মালিকানা যখন বাতিল করা হল তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই তা নিয়ে যথেষ্ট জল ঘোলা হয়েছে। কোথাও কোথাও সশস্ত্র প্রতিরোধেরও মোকাবেলা করতে হয়েছে রাষ্ট্রকে। এখন সেসব অতীত ইতিহাস।

যৌথ খামারকে একটি কৃষি উৎপাদন কারখানা বলা যেতে পারে। কারখানার যেমন ইনজিনিয়র থাকে। প্রচুর বেতনভুক বিশেষজ্ঞ থাকে, বহু যন্ত্রপাতি থাকে এক একটা যৌথ খামারেরও তাই। ট্রাকটর, ফসল তোলা ও ঝাড়াই-এর মেশিন, ট্রাক, জিপ, গাড়ি, কর্মচারীদের ক্যানটিন, চীপ স্টোর, বিনোদনের ব্যবস্থা, স্কুল ট্রেনিং সেনটার কলকারখানায় যা আছে সবই আছে যৌথ খামারে। যৌথ খামারের বৈশিষ্ট্য হল, এর পরিচালন গণতান্ত্রিক। ওপর থেকে কাউকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। পাঁচজন চাষী সদস্য পিছু একজন করে প্রতিনিধি মনোনীত হয়। প্রতিনিধিরা মিলে একটি সভা গঠন করেন। সভা প্রতি তিনবছর অন্তর একজন করে চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন।

আমাদের 'মারহামাত' (অভ্যর্থনা) জানালেন। যৌথ খামারের চেয়ারম্যান উয়াস দানফ আমাদের নিয়ে বসালেন তাঁর অফিসে। একটি কারপেটের ওপর মসকোর রেড স্কোয়ারের ছবি। আর একদিকে লেনিনের একটি বিরাট ছবির এমব্রডয়ারি।

চা খেতে খেতে পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। সব শুদ্ধ ২২ জন বিশেষজ্ঞ আছেন। এই যৌথ খামারটিতে প্রধানত তুলার চাষ হয়। তাই তুলোর চাষের বিশেষজ্ঞরা আছেন। আছেন মেকানিক। তাছাড়া চাষীদের গরু বাছুরের প্রজননের ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ আছেন। এই সব বিশেষজ্ঞের

চাকরিতে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। খামারের দুটি ছেলে এখন বিশেষজ্ঞ হবার জন্য শহরে পড়াশোনা করছে। খামার থেকেই তাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান জানালেন, তাদের যৌথ খামারের মোট জনসংখ্যা ৬৭০০। এদের মধ্যে ১২০০ খামারে কাজ করেন। ১৫০০ জন কোন কাজ করেন না। তাদের মধ্যে ৭০০ অবসরপ্রাপ্ত, বাকিরা গৃহবধূ। ৪০০০ স্কুল ছাত্র। যৌথ খামারের অফিস থেকে বেশ কিছুটা দূরে মাঠের মধ্যে যৌথ খামরের ফিলড অফিসে এলাম। ছায়াঘেরা একটি এলাকা। বাংলো প্যাটারনের বাড়ি। উঠোনে চাঁদোয়া পাতা। নিচে চেয়ার টেবিল। টেবিলে প্রচুর আঙুর, আপেল আর হাতে গড়া বিরাট বিরাট রুটি। এটি চাষীদের বিশ্রাম নেবার জায়গা।

মেয়েরাও কাজ করছেন। তবে তাঁরা কেউ এগিয়ে এলেন না। শুধু অতিথিদের দিকে তাকিয়ে কাজে মন দিলেন। চেয়ারম্যান বললেন : আমাদের খামারে যারা কাজ করে তারা ফ্রি লানচ পায়। এখানে এসে খেয়ে নেয় তারা। টিফিনের সময় ইনডোর গেমেরও ব্যবস্থা আছে।

হিসাব দিলেন, বছরে চার হাজার টন তুলো হয়। হাজার টন দুধ। দেড় হাজার টন ফল, ১৪০০ টন আঙুর, ১৪ টন রেশম কীট, দুহাজার টন তরমুজ। পরিসংখ্যান কণ্ঠস্থ তাঁর। বলে চলেন : ৩০০ টন মাংস। তুলো ও রেশমকীট ৭০ ভাগ সরকারকে বিক্রি করা আবশ্যিক। বাকিটা সদস্যদের মধ্যে বিক্রি করা যায়।

আমি বললাম : শুনেছি চাষীরা কিছুটা ব্যাক্তিগত জমি রাখতে পারে। তার পরিমাণ কত ?

উত্তর হল : ০·২০ হেকটর মত জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখা যায়। এছাড়া চাষীরা ১০টি ভেড়া ছাগল ও গরু, পর্যাপ্ত মুরগী, শূকর ও মৌমাছি রাখতে পারে। ১৯৮২ সালে যে নতুন খাদ্যনীতি ঘোষিত হয়েছে তাতে চাষীরা আরও বেশি গৃহপালিত পশু রাখতে পারবেন।

একটু পরে গরম বাটিতে করে বীফ সুরূপ এল—অর্থাৎ স্যুপ। চুমুক দিতে দিতে আরও তথ্য জানা গেল যৌথ খামার সম্পর্কে। যেমন সমস্ত ফসল বীমা করা থাকে বলে মুনাফার গ্যারানটি রয়েছে। যৌথ খামার প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে। বছরে দশ লক্ষ রুবল খরচ করে ওরা বাড়ি ঘর হাসপাতাল স্কুল তৈরী করেছে।

চাষীরা কত আয় করে?

একজন চাষীর বেতন মাসে ১৪০ রুবল। ড্রাইভারের বেতন ১১৭ রুবল। স্পেশালিসটরা পায় ২০০ রুবল। চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ বেতন পান—২৪০ রুবল। তবে সবারই ব্যক্তিগত জমি আছে। বেশি উৎপাদন হলে বোনাসের ব্যবস্থা আছে। স্কুলের বাড়িঘর তৈরি করে দেয় ফারম। শিক্ষকের বেতন দেন সরকার। তবে হাসপাতালের যাবতীয় খরচ সরকারের।

চেয়ারম্যান বলছিলেন: ১৯৩২ সাল থেকে তাজিকিস্তানে যৌথ খামারের কাজ শুরু হয়। আগে জমি ছিল জমিদারের। বর্গাদারেরা পেত এক ভাগ। চার ভাগ পেত জমিদার। তবে জমির জাতীয়করণ করে জোতের যৌথীকরণ খুব সহজে হয়নি। বহু লোক এর প্রতিবাদ করে। সশস্ত্র প্রতিরোধের পথও বেছে নেয়। এর ফলে প্রতিরোধকারীদের মোকাবেলা করতে হয়। তাদের অনেককে গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সাইবেরিয়ায়। অনেকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরেও আসে। একজন বৃদ্ধ এখনও আছেন। তিনি একদা প্রতিবিপ্লবীদের দলে ছিলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁকে আবার নতুন সমাজে নিয়ে নেওয়া হয়। তিনি এখন একটি ব্রিগেডের পরিচালক। প্রতিবিপ্লবীরা এক সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদত পেত, ইরানের আনোয়ার পাশা তাদের মদত দিতেন।

আমার প্রশ্ন: যৌথ খামারে সারাদিন কাজ করে ব্যক্তিগত জমিতে চাষ করার সময় পান কোথা থেকে?

: বছরে ১৮ দিন ছুটি পান কৃষকেরা। মেকানিকরা পান ২২ দিন। এ ছাড়া বাড়ির জমি চাষ করার জন্য তাকে সময় দেওয়া হয়।

ঃ চাষীরা কিভাবে ছুটি কাটান ?

ঃ আমাদের স্পেশ্যাল ফানড আছে, তা থেকে টাকা দিয়ে চাষীদের টুরিসট স্পটে পাঠান হয়।

ঃ চাষীরা কি ধর্মপরায়ণ ?

এলাকায় তুটো মসজিদ আছে। অনেকেই নামাজ পড়তে যান, তবে কাজের অসুবিধে হয় বলে রোজার সময় পালটে দেওয়া হয়েছে।

ঃ বিয়ে শাদি কি ভাবে হয় ?

ঃ তু'ভাবে। সব বিয়েই রেজিসট্রি করার নিয়ম, যারা প্রথাবদ্ধ বিবাহ অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী তারা এরপর বাড়ি গিয়ে আলাদা অনুষ্ঠান করেন। কারও বিয়ে হলে আংটি কেনার জন্য স্টেট টাকা দেয়।

ঃ চাষী পরিবারে লেখাপড়ার চল কি রকম ?

ঃ মধ্যবয়সী সমস্ত মহিলাই মাধ্যমিক পাশ। তবে আমাদের মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। প্রত্যেকেরই ৫ থেকে ১০টা করে ছেলেমেয়ে। তাদের দেখাশোনা, পশুদের পরিচর্যা, করে ওরা আর চাকরি করার সময় পায় না।

ওই খামারে একটি সিনেমা হল ও আর একটি পাবলিক হল আছে।

থিয়েটার লেগেই আছে। ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার গ্রুপ প্রায়ই আসে। সপ্তাহে তিনদিন করে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

আমাদের কথাবার্তার মাঝেই চাষীরা খামার থেকে আসতে শুরু করলেন। লানচের সময় হয়ে গেছে। কাজের পোশাক পরা—ফিটফাট সকলে। ক্ষেতের কাজে এখন বহুলাংশে যন্ত্রীকরণ হয়ে হয়ে গিয়েছে। সুতরাং চাষী বলতে আর আগের মত নিরন্ন, খালি গা রুগ্ন, শোষিত মানুষের ছবি ফুটে ওঠে না।

ফেরার সময় চাষীদের গাঁ-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। মসকোর কাছে রাষ্ট্রীয় খামারে যেমন সারি সারি সরকারি কোয়াটারস দেখেছিলাম এখানে তেমন নেই। মাঠের মধ্যে টালি বা অ্যাসবেসটাসের ছাউনি দেওয়া ঘর। খুব যে সমৃদ্ধ তা নয়। কিন্তু তার মধ্যেও টি. ভি.

আছে, বিদ্যুৎ আছে। আছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ফসল বিক্রি নিয়ে কোন উদ্বেগ নেই। একটা নিশ্চিন্ত জীবন। শহরের তুলনায় গ্রামের জীবন অনেক সরল এমনকি হয়ত জীবনযাত্রার মানও নিচু কিন্তু শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরাট ফারাক কোথাও চোখে পড়ে না। রাস্তাঘাট, বাস, পাবলিক ইউটিলিটি সর্বত্রই একই মানের।

মসৃণ রাজপথ ধরে আমাদের গাড়ি ছুটছিল।

সকালে মেঘলা আকাশের পর রোদ উঠেছে। আমরা এগিয়ে চলেছি।

সাইবেরিয়া

সাইবেরিয়াতে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনাদের ভারতে সাইবেরিয়া সম্পর্কে ধারণা কীরকম? আমি বলেছিলাম: হয় কোন ধারণাই নেই, না হয় সাইবেরিয়া সম্পর্কে আমরা বুঝি বছরের সব সময়ে বরফে ঢাকা এক দুর্গম দেশ, মাইলের পর মাইল জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে মানুষকে পাঠান হয় নির্বাসনে।

দশদিন ধরে সাইবেরিয়ার উত্তরে, দক্ষিণে প্রায় ছ-হাজার মাইল ঘুরে আমি যদি বলি: পাহাড়, হ্রদ, নদী আর জলাশয়ে ভরা এক দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট বিশাল সৌন্দর্যময় প্রকৃতির নাম সাইবেরিয়া, যেখানে বড় বড় শহর আছে, আছে আধুনিক জীবন-যাত্রার যাবতীয় উপকরণ, আছে পাইন ও ফার গাছের সারি, একদা নির্বাসিতদের বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে এখন শুধু সৃষ্টি-সুখের উল্লাস, তাহলে হয়ত অবাক হবেন অনেকে।

সাইবেরিয়া যার বাংলা অর্থ ঘুমন্ত নগরী, তার আয়তন ১ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। গোটা সাইবেরিয়া শুরু হয়েছে পশ্চিমে উরাল সমুদ্রের পূর্বতীর থেকে, আর শেষ হয়েছে পূর্বে জাপান সমুদ্রের উপকূলে। উত্তরে সুমেরু বা Arctic অঞ্চল থেকে দক্ষিণে আলতাই পর্বতমালা পর্যন্ত। গোটা এলাকা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের চেয়েও বড়। পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ জুড়ে এই বিরাট বিশাল সাইবেরিয়া ভূখণ্ড। স্মরণাতীতকাল থেকে সাইবেরিয়া ছিল দুর্গম দুস্তর। পর্বত, বন, জলাভূমি আর বছরের অধিকাংশ সময় হিমশীতল আবহাওয়া ঢাকা যেন এক মৃত্যুভূমি। কিন্তু এই বিরাট ভূখণ্ডের নিচে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর চার ভাগের তিনভাগ খনিজ সম্পদ আর জ্বালানি সম্পদ। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কয়লা মজুত আছে এই দেশে। সাইবেরিয়ার মাটির নিচে আছে ভাল ভাল সোনা আর হীরে। সাইবেরিয়ার কিছুটা ইওরোপে কিছুটা এশিয়ায়। ইয়েনেসি নদী পর্যন্ত

সাইবেরিয়া। এই নদী পেরিয়ে পূর্ব দিকে চলে যান, আপনার সামনে উদ্ভাসিত হবে এশিয়া-সোভিয়েত ইউনিয়নে যাকে বলা হয় দূর প্রাচ্য। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য এই দুই সংস্কৃতিতে লালিত সাইবেরিয়া। সাইবেরিয়ার আদিবাসীর জীবন ধারায় প্রাচ্যের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। সাইবেরিয়ার উত্তরে সুমেরু প্রদেশের কাছাকাছি যত আসা যায় তত বেশি ধূ ধূ করে রুক্ষতা। সবুজের চিহ্ন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ব সাইবেরিয়াতে যতদূর তাকাবেন দেখবেন সবুজ সমভূমি। দক্ষিণে বিরাট পাহাড়ের রেঞ্জ। কিন্তু একমাত্র সুমেরু ও তুন্দ্রা অঞ্চল ছাড়া সাইবেরিয়া সবুজ—ঘন সবুজ অরণ্যানীতে ঢাকা প্রকৃতির মায়াময় রহস্য ভাণ্ডার।

সাইবেরিয়ার প্রাচীন শহরগুলি আজ সমৃদ্ধ। দুর্গম অরণ্য ও পর্বত চিরে তৈরি হয়েছে আরও নতুন আধুনিক শহর। সাইবেরিয়া আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের যেকোন অঞ্চলের মতই সমান আধুনিক। নব জীবনের স্পন্দনে উদ্বেলিত এই সাইবেরিয়ায় প্রকৃতি ও মানুষের কথা পাঠকদের জানাবার জন্যই আমি সাইবেরিয়া যাত্রা করেছিলাম।

একে ইংরেজির তেরো তারিখ, তার ওপর বিষ্যুৎবার এবং তদুপরি বারবেলা, এই ত্র্যহস্পর্শে যেখানে যাত্রা নাস্তি সেখানে যাত্রার কিছুটা বাধা ঘটবে তাতে আশ্চর্য কী! কিন্তু সাহেবরা যখন আমন্ত্রণ করেন এবং দিনক্ষণ তাঁরাই ঠিক করে দেন, অনুমান করতে পারি তাঁদের হাতে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা থাকে না। তাঁরা শুধু জানিয়ে দেন অমুক দিন অমুক তারিখে অমুক প্লেনে আপনাকে আসতে হবে। তদনুযায়ী ১৩ জুন ১৯২১ বিষ্যুৎবার দমদম থেকে মস্কোগামী এয়ারোফ্লোটে চাপা। সোভিয়েত ইউনিয়নে এবার আমার তৃতীয়বার ভ্রমণ। প্রথমবার শুধু মস্কো, দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম মধ্য এশিয়াতে। তৃতীয়বার যাত্রা এই সাইবেরিয়ায়। প্রথম বিপত্তি ঘটল মস্কোতে নামার আগে। কলকাতা থেকে বম্বে ঘণ্টা দেড়েকের বিরতি। তারপর একটানা সাত ঘণ্টা উড়বার পর ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে যেই ঘোষণা হল

আর বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা মস্কো বিমান বন্দরে অবতরণ করছি তখন শুনে আশ্বস্ত হলাম যে যাত্রা বুঝি নির্বিঘ্ন হল। কিন্তু বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে হাসলেন। বিশ মিনিট কেটে চল্লিশ হতে চলল, তখনও মস্কোর দেখা নেই। হঠাৎ শুনলাম ঘোষণা, খারাপ আবহাওয়ার জন্য আমরা মস্কো বিমান বন্দরে নামতে পারব না, বিমান অবতরণ করবে কিয়েভ বিমান বন্দরে।

আমাদের যাত্রীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক একদল রুশ শিল্পী, যাঁরা কয়েকদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এঁদের মধ্যে এক তরুণ বসেছিলেন আমার ঠিক সামনে। দুই ভিনদেশি তরুণী যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন গতকাল রাতে। সেই সুবাদে আমারও সময় কাটল মুফতে ম্যাজিক দেখে। আর একপাশে বসেছিলেন বজবজের এক বাঙালি টেকসটাইল এঞ্জিনিয়ার। ইংরেজ পত্নী ও ছেলেকে নিয়ে চলেছেন শ্বশুরবাড়ি লণ্ডনে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কয়েকজন বাঙালি মহিলা চলেছেন লণ্ডনে। মস্কো থেকে কানেকশান ফ্লাইট ধরবেন। মস্কোর বদলে কিয়েভ অবতরণের সংবাদে সকলের মুখেই বিরক্তি। টেকসটাইল এঞ্জিনিয়ার মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, তেরো তারিখে যাত্রা করব না ভেবে আগের দিন বজবজ থেকে বেরিয়ে কলকাতার হোটেলে এসেছিলাম কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি এয়ারপোর্টে দুটি অংশ। একটি দেশী যাত্রীদের জন্য। আর একটি বিদেশি যাত্রীদের। প্লেন কিয়েভে থামার পর আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু অতঃপর কিংকর্তব্য, সে সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারলেন না। এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে। ভোর থেকে প্লেনে চাও জোটেনি। বেশ কিছুক্ষণ পরে আদেশ হল আমাদের এখানেই ইমাইগ্রেশন চেকিং হবে। চেকিং-এর পর আমরা আর একটি ট্রানজিট লাউঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেউ বলল: আমাদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে। দুজন বাঙালি যাত্রী উত্তেজিত হয়ে বলাবলি করতে

লাগলেন : মস্কোতে খারাপ আবহাওয়া, তা আগে থেকে জানাতে পারল না। নিশ্চয়ই একটা গণ্ডগোল হচ্ছে মস্কোতে।

: মস্কোতে গণ্ডগোল কেন ? কখনও তো হয় বলে শুনিনি ?

: হয় মশাই, জানতে পারেন না। নিশ্চয়ই একটা বনবেড়াল মার্কা স্ট্রাইক হয়ে গেছে সেখানে।

গুজবে কান দেব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি বহুবার। তবু কান দিতে হয়। কারণ এই মুহূর্তে কান বেচারার শোনা ছাড়া আর কোন কাজ নেই।

ঘণ্টা তিনেক কিয়েভ বিমান বন্দরে বসে ইউক্রাইনের সবুজ মাঠ আর গাছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন খিদে ভোলার চেষ্টা করছি তখন ডাক এল, মস্কো বিমান বন্দর মুক্ত হয়েছে।

আবার এক ঘণ্টার পথ মস্কো। প্লেনে বসে বাঙালি যাত্রীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। সকাল থেকে এক কাপ চাও দিল না মশাই। যদি আমাদের দেশে এমন ঘটনা ঘটত তাহলে কি ছেড়ে কথা বলত কেউ ? শুধু উত্তেজনা নেই রুশী যাত্রীদের মধ্যে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব, রসিকতা করছেন। এই অসীম ধৈর্য ও স্থৈর্যই পশ্চিমের প্রাণশক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষ তো এমনিতেই শৃঙ্খলাপরায়ণ। কিন্তু আমি পশ্চিম ইওরোপেও দেখেছি মানুষ সহজে উত্তেজিত হয় না। কিউতে দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘ সময়। কারও চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না।

মস্কো বিমান বন্দরে প্লেন যখন নামল তখন সকালের দুর্যোগ কোথায় ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। এই মেঘ রৌদ্রের খেলা ইওরোপে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। আবহাওয়া বার্তা সেখানে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু প্লেন তো রানওয়ে স্পর্শ করল। তবু সিঁড়ি লাগাবার নাম নেই। এদিকে প্লেনের এ সি অফ করে দেওয়া হয়েছে। এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি প্লেনে। মনে হচ্ছে হাইজাক প্লেনের যাত্রী আমরা। এক বাঙালী তরুণ বেল টিপে বার বার এয়ার হোস্টেসকে

ডাকছেন। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারছে না। মাঝপথে ট্রেন থেমে গেলে যেমন অসহিষ্ণু যাত্রীরা পরস্পরকে প্রশ্ন করেন, দাদা কী হয়েছে বলুন তো? এমন ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তর রিলে হতে হতে চারিদিকে চাউর হয়ে গেল, এক সঙ্গে অনেক প্লেন এসে পড়েছে। তাই খালাস হতে দেরি হচ্ছে। পর্যাপ্ত বাসও নাকি নেই। কিন্তু সরকারিভাবে কেউ কিছু বলছেন না। অবশেষে ঘণ্টাখানেক পরে বাস পাওয়া গেল। এয়ারপোর্টে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে বিরাট লাইন। অন্য এয়ারপোর্টের মত গ্রীন চ্যানেল নেই যে, নাথিং টু ডিক্লেয়ার বলে বেরিয়ে যাব। প্রথমে ইলেকট্রনিক চেকিং। তারপর এক্সরে। আমাকে স্যুটকেস খুলতে হল না। কিন্তু আমার আগের এক রুশ যাত্রী একাই পাকা চল্লিশ মিনিট নিয়ে নিলেন। তাঁর প্রতিটি স্যুটকেস ও ব্যাগ খুলে সমস্ত জিনিস তন্ন তন্ন করে চেক করা হল।

প্লেন অবতরণ থেকে ফর্মালিটি পেরিয়ে যখন বাইরে এলাম তখন আড়াই ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। আমাকে রিসিভ করতে এসেছিলেন আমার পুরানো পরিচিত বন্ধু ল্যাংকিন সাহেব। দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন। মাতৃভাষার মত বাংলা বলতে পারেন।

আমাকে দেখে বললেন: খুব কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি।

বললাম: কষ্ট যেটুকু হয়েছিল, মস্কোর এই সুন্দর আবহাওয়া আর আপনার সান্নিধ্যে সব ভুলে গেছি।

: হ্যাঁ, অনেক দিন পরে মস্কোতে রোদ উঠল। আজ ভোর বেলায়ও দারুণ কুয়াশা ছিল। যার জন্য প্লেন নামতে পারল না।

: আপনি সেই ভোরবেলা থেকেই আছেন?

: না। যখন দেখলাম প্লেন লেট, তখন বাড়ি গিয়ে ছুটো খেয়ে এলাম। আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত?

: একটু।

: তাহলে আমরা আর আপনার জন্য কোন প্রোগ্রাম রাখব না। সোজা হোটেলে। খেয়ে বিশ্রাম। আগামী কাল ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। কাল আমাদের সাইবেরিয়া যাত্রা।

: নভোসিবিরস্ক। দেমোদেভো এয়ারপোর্ট থেকে যেতে হবে। সেটা আবার শহর থেকে আটাশ কিলোমিটারের মত।

মস্কোর পরিচিত রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি ছুটছে। চওড়া রাস্তা। মাঝখানে সবুজ বুলেভার্দ। দুপাশে গাছের সারি। আর তার পিছনে বিরাট বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি। মস্কো শহরে আর ছোট বাড়ি নেই। সবই প্যালেস, না হয় মালটিস্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্ট। আমরা এলাম হোটেল বুদাপেস্তে। পুরনো হোটেল। এলাকাটিও পুরনো। পুরনো আমলের বাড়ি দুপাশে। হোটেলটির সংস্কার হচ্ছে।

মস্কো শহরে দুপুর বেলা রেস্টুরেণ্টে জায়গা পাওয়া মুশকিল। আমার নিজের ধারণা জনসংখ্যার অনুপাতে রেস্টুরেণ্ট কম। পশ্চিমী দুনিয়ার মত পথের মোড়ে মোড়ে কাফে বা ফাস্ট ফুডের দোকান এদেশে নেই।

বেলা তিনটে বেজে গিয়েছিল, তাই বুদাপেস্তের রেস্টুরেণ্টে জায়গা পাওয়া গেল এবং খাবারের জন্য বেশিক্ষণ বসতে হল না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বছরের পর বছর ধরে খাবারের দাম বাড়েনি। ১৯৭৮ সালে আমি যে দামে খাবার খেয়েছিলাম, ১৯৮৫ সালেও সে দামের বেশি ইতর-বিশেষ হয়নি। এক বোতল রেড ওয়াইন সহ স্যুপ, চিকেন কাটলেট ও স্যালাডের দাম পড়ল দশ রুবল। সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশীদের জন্য হোটেলেও নামমাত্র ভাড়া। আমার জন্য যে ঘরের ভাড়া চল্লিশ রুবল, একজন রুশী থাকলে দেবেন চার রুবল। (১ রুবল = ১৫ টাকা)

ল্যাংকিনের সঙ্গে কথা হল, তিনি আগামী কাল ভোর পাঁচটায় আমায় নিতে আসবেন।

খাওয়া দাওয়ার পর পথশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল টেলিফোনে। পার্থবাবু আছেন?

হঠাৎ বাংলায় সম্ভাষণ শুনে ভাবলাম বোধ হয় মস্কো প্রবাসী সুবীরবাবু কিংবা প্রফুল্লবাবু ফোন করছেন। তাই বলে উঠলাম : কে

বলছেন ?

: আমি ল্যাংকিন।

: ও। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

: ডিনারে যাবেন না ?

ঘড়িতে দেখলাম রাত নটা অথচ বাইরে তখনও রোদ্দুর। বুঝতেই পারিনি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি।

আমি বললাম : ফোন করে ভালই করলেন, এই যাচ্ছি।

: কাল ভোরে ওঠার কথা মনে করিয়ে দিলাম।

: আমার মনে আছে, ঠিক সময়ে আমায় পাবেন।

তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মস্কোর তাপমাত্রা এখন ১২ ডিগ্রি সে:। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস নেই বলে শীতটা বরং মনোরম লাগছে। তাছাড়া বাতাসে আর্দ্রতা নেই। রাত নটা। উইক-এণ্ডের রাত্রি। পথে লোকের অভাব নেই। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের শহরগুলি ক্রাইম থেকে মুক্ত। ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই এসব ঘটনার কথা শোনা যায় না। লোকে তাই নির্ভয়ে চলাফেরা করে।

খাবার জন্য রেস্টুরেণ্টে ঢুকলাম। তখন রেস্টুরেণ্ট জমজমাট। ক্রুনা গান গাইছে অতিথিদের বিনোদনের জন্য। তথাকথিত নাইট ক্লাব সোভিয়েত ইউনিয়নে নেই। মনোলোভা নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন। লণ্ডন, প্যারি, নিউইয়র্ক, টোকিও, হংকং, সানফ্রান্সিস্কোর মত মস্কোর রাত্রিতে মাদকতা নেই। কিন্তু গ্রীষ্মের রাত্রিতে স্নিগ্ধ ঠাণ্ডায় মসৃণ চওড়া ফুটপাথ দিয়ে মস্কো শহরে নির্ভয়ে হেঁটে বেড়াবার মত আরাম আর নেই। যদি সঙ্গিনী থাকে তাহলে সে আরাম স্বর্গ সমান।

আমার নানা দুর্নামের মধ্যে একটি হল আমি ব্যস্তবাগীশ। আমার সমস্ত দুর্নামের জন্য আমি দায়ী নই, তবে ব্যস্তবাগীশতার অভিযোগ স্বচ্ছন্দে মাথা পেতে নিই। কোথাও যাবার নাম শুনলে আমার টেনশন হয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখনও দুটো দুঃস্বপ্ন দেখি—পরীক্ষায় ফেল করেছি আর ট্রেন ফেল করেছি। অবশ্য বাস্তবে এই দুটি কখনও ফেল করিনি।

তবে আমার চেয়ে আরও ব্যস্তবাগীশ ল্যাংকিন। সকাল আটটায় প্লেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে তৈরি থাকতে। পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে তিনি দেখি দরজার টোকা দিচ্ছেন।

একটু আগেই এসে পড়লাম।

'আমিও তৈরি।

: আপনার পাসপোর্ট নিয়েছেন ?

: হ্যাঁ। গতকাল হোটেলে পাসপোর্ট জমা দিয়েছিলাম। রিসেপশনের ভদ্রমহিলা বলেছিলেন দুঘণ্টার মধ্যে ফেরত পাবেন। কিন্তু রাত ন'টার সময় পাসপোর্ট ফেরত নিতে যেতেই বললেন আজ নয়, কাল সকাল ন'টার সময়। 'আমি তখন বললাম—সে কী, কাল ভোরে আমার চলে যাবার কথা। আমার এখনই পাসপোর্ট চাই। কী মনে ভেবে ভদ্রমহিলা পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বললেন, নিন, এখানে সই করুন। ল্যাংকিন আমার পাসপোর্টটির ভিসার পাতা দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন।

: কী হল ?

: করেছেন কী ? আপনার ভিসা রয়েছে নভোসিবিরস্ক আর ইর্য়ারকুতের জন্য। আমরা যাচ্ছি ইয়াকুস্ক। প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে এখন তো আর যেতে পারবেন না। গতকালও যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম।

আমি বললাম : কলকাতা কনস্যুলেট থেকে আমাকে এই ভিসাই দিয়েছে। আমি তো জানতাম না, কোন কোন শহরে আমার প্রোগ্রাম আছে। তাছাড়া জানলেও কিছু করতে পারতাম না। এক, ভিসা লেখা রুশী ভাষায়। দুই, কোন কোন শহর আমার দেখার জন্য ঠিক করা হয়েছে তা আমি জানি না। তাছাড়া প্রায় এক রকমের দুই শহরের মধ্যে তফাৎ বোঝা আমার মত বিদেশির কর্ম নয়। আমার যতদূর মনে হচ্ছে এটি টাইপের ভুল দুটো অক্ষরের হেরফের। আপনাদের দফতরকে বললে সেটা ঠিক করে দেবে।

ল্যাংকিন যেন দপ করে নিভে গেলেন। তিনি বললেন : এখন

সবই ওপরওয়ালার হাত। আমি কিছুই বলতে পারছি না। ভারতে থেকে ল্যাংকিন কথায় কথায় ওপরওয়ালা, ভগবান শব্দগুলি মজা করে ব্যবহার করেন। যেমন প্লেনে উঠে বলেছিলেন, মস্কো থেকে নভোসিবিরস্কের টাইমের তফাৎ চার ঘণ্টা। আসার সময় চার ঘণ্টা লাভ হবে। ভগবান যেমন নিয়ে নিলেন, তেমনি আবার দিয়ে দিলেন।

মেরু অঞ্চলে ছমাস দিন ছমাস রাত্রি। সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রীষ্মকালে রাতের আয়ু মাত্র কয়েক ঘণ্টা। কারণ ভোর পাঁচটায় উঠে দেখি ভোরের আলো ফুটে গেছে। ল্যাংকিনের ট্যাক্সি বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমাদের নিয়ে গাড়ি ছুটল দোমোদেভো এয়ারপোর্টের দিকে। মস্কো শহর গ্রীন বেল্ট দিয়ে ঘেরা। অর্থাৎ শহর শেষ হলেই চারিদিকে পড়ে ঘন জঙ্গল। সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্যাক্সি যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছল, তখন ছটা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শহরের ব্যস্ততম ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টকে দেখে মনে হয় যেন হাওড়া স্টেশন। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বহু লোক মালপত্র নিয়ে মাটিতে বসে আছেন। ল্যাংকিন আমাকে নিয়ে ইণ্টারন্যাশনাল লাউঞ্জে গেলেন। বিদেশি যাত্রীদের চেকিং কাউণ্টারও আলাদা। দেশি যাত্রীরা আসার আগেই আমাদের প্লেনে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর দেশি যাত্রীদের ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল বোয়িং ৭০৭। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গোটা পরিবার চলেছে। প্লেন যাবে প্রথমে নভোসিবিরস্ক। তারপর চিতা বলে আর একটি শহরে।

বহু রাশিয়ান কর্মসূত্রে সাইবেরিয়ায় আছেন। ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরছেন। কেউবা হয়তো যাচ্ছেন নতুন কাজে যোগ দিতে।

প্রায় চার ঘণ্টার দীর্ঘ ২৫০০ কিলোমিটার পথ। মস্কো থেকে লণ্ডনের চেয়েও বেশি। আমি খুশি হতাম যদি ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলে চড়ে তিনদিন পরে এসে পৌঁছতাম নভোসিবিরস্ক। আরও চারদিন ট্রেনে চেপে গিয়ে পৌঁছতাম সুদূর প্রাচ্যে জাপান সমুদ্রের তীরে।

ভাবা যায়, কী বিশাল এই ভূখণ্ড! পৃথিবীর ছ'ভাগের এক ভাগ জুড়ে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ২ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গমাইল এই

আয়তনের মধ্যে তিনটি ভারতকে পুরে ফেলা যায়। ১২টি দেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে এ দেশের। তিনটি সীমান্ত রক্ষা করতেই আমাদের হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ৬০ হাজার কিলোমিটার সীমান্ত সামলাতে হয়।

ওব নদীর ওপর চক্কর খেতে খেতে নভোসিবিরস্কে এসে প্লেন নামল। রানওয়ে বৃষ্টির জলে সিক্ত। বিদেশিদের বিশেষ নজরে রাখার ব্যবস্থা সর্বত্র। এয়ারপোর্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার খবর পেয়ে গিয়েছিলেন আমি আসছি। তিনি রানওয়েতে দাঁড়িয়ে ছিলেন অভ্যর্থনার জন্য। সোজা নিয়ে গিয়ে তুললেন আন্তর্জাতিক লাউঞ্জে। সেখানে ফর্মালিটি সেরে এয়ারপোর্টের বাইরে গেলাম। কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে যেতেই অভ্যর্থনা জানাল এক ঝাঁক মশা। মশা তো নয়, যেন বিহঙ্গ। কিন্তু কামড়াল না। শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমানের মত এসে তারা আমার মুখের চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল। এমতাবস্থায় কিংকর্তব্য ঠিক করার আগে দেখলাম ল্যাংকিন আমার স্যুটকেসটি খালাস করে নিয়ে এসেছেন।

শহরের সমস্ত ট্যাক্সি ও বাস কর্দমাক্ত। বৃষ্টি হয়ে রাস্তার দুপাশে কাদা জমেছে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। যাঁরা সাইবেরিয়া যাচ্ছি শুনে আঁতকে উঠেছিলেন তাঁদের সবিনয়ে জানাই সাইবেরিয়ায় এই সময় আবহাওয়া মনোরম। তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেঃ। শীতকালে মাইনাস ত্রিশ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ডিগ্রি সেঃ হয়। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও এখানকার জনজীবন কিন্তু থেমে থাকে না। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে ঢোকার পথে পথে দু-একটি গ্রাম পড়ল। গ্রামে এখনও সাবেকি আমলের কাঠের বাড়ি। মনে হয় আসামের কোন উপত্যকা দিয়ে চলেছি। পাহাড় নেই কোথাও। যেদিকে তাকাও সবুজ প্রান্তর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়লাম নভোসিবিরস্ক শহরে।

যে হোটেলে উঠলাম তার নাম ইংরাজিতে সেণ্ট্রাল হোটেল। শহরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। পাশেই অপেরা হাউস। হাঁটা-পথেই আছে থিয়েটার হল। গাছ ছাড়া শহরে পরিকল্পনার কথা ভাবাই

যায় না এদেশে। তাই শহরে সমস্ত রাস্তার ধারেই সবুজের সমারোহ। রাস্তা যতখানি চওড়া তার দ্বিগুণ চওড়া এই তরুবীথীর তলা দিয়ে পায়ে চলা পথ। এই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যেবেলা গেলাম মস্কো স্টেট সার্কাস দেখতে।

ল্যাংকিন বললেন : সাইবেরিয়াতে রাশিয়ানরা আসে আজ থেকে ছশো বছর আগে। কী দুর্গম ছিল তখনকার রাস্তা ঘাট। কিন্তু মানুষের দুর্জয় অভিযানের কাছে নতি স্বীকার করে প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা। তারপর ১৮৯৪ সালে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে এই শহরের পত্তন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এসে পৌঁছলাম স্টেট সার্কাস হলে। তার সামনেই বহু পুরনো রুশ অর্থোডক্স চার্চ, সেখানে সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় যোগ দেবার জন্য যথেষ্ট ভিড়। সোভিয়েত ইউনিয়নে চার্চ ও মসজিদে ধর্মার্থী মানুষের ভিড়ের কমতি নেই। ধর্ম নিয়ে যেমন আতিশয্য নেই তেমনি ধর্ম আচরণের ওপর কোন বাধাই নেই। যদিও মার্কসীয় শিক্ষার একটি অঙ্গ নাস্তিক্যবাদ। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি কিনা জানি না তবে ঈশ্বর যে মানুষেরই সৃষ্টি তার প্রমাণ চরম প্রাচুর্য, চরম দারিদ্র্য এমনকী চরম নিপীড়ন বা পরম সুখের মধ্যেও মানুষ বরাবর ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্মরণ করে আনন্দ পায়। সৌন্দর্যানুভূতি ও সুখানুভূতির মত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসও মানুষের এক আনন্দানুভূতি, মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসও বেঁচে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অনুভূতি ব্যক্তিগত আপনাতে আপনি নিবদ্ধ ততদিন তাতে সমাজের কোন অমঙ্গল নেই। কিন্তু যখন ধর্ম পরিণত হয় শুধু আচারে এবং ধর্মচেতনা গোষ্ঠীবদ্ধতার রূপ নেয় তখন মানুষ আপন ধর্ম ও ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তখনই তা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপদ ঘনিয়ে আসে। ধর্মীয় উন্মাদনার চেয়ে ঈশ্বরে অবিশ্বাস বরং অনেক বেশি শ্রেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মসজিদ ও গীর্জার দ্বার এখন শুধু উন্মুক্তই নয়, মনেস্টারিতে ধর্মযাজকেরা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করছেন পরম নিশ্চিন্ততায়

সঙ্গে। ১৯৮২ সালে মস্কো শহরের কাছেই গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের এমন এক মঠে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে তরুণ ধর্মযাজকেরা ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীর অর্থোডক্স চার্চগুলির ভার নেবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। তাঁদের পাঠক্রম দীর্ঘ, তপশ্চর্যার কাল দীর্ঘতর। নভোসিবিরস্ক অর্থোডক্স চার্চের ভেতরেও গিয়েছিলাম। ভেতরটি এত ঐশ্বর্যপূর্ণ যে মনে হয় চার্চ কর্তৃপক্ষ বেশ সমৃদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নেও দেবোত্তর সম্পত্তি যাবতীয় কর থেকে মুক্ত তবে চার্চের কর্মীদের সরকার থেকে পেনশন দেওয়া হয় না। তাঁদের পেনশন দেন চার্চ কর্তৃপক্ষ। শুনলাম অর্থোডক্স চার্চে শতকরা ছয় থেকে দশটির বেশি পরিবার ছেলেমেয়েদের ব্যাপটাইজ করতে বা বিয়ে দিতে আসে না। চার্চে বিয়ে হলেও সে বিয়ে রেজিষ্ট্রী করা দরকার। অবশ্য বিয়ে না করেও নারী পুরুষের একত্র বাসের অধিকার আছে।

রবিবার বিকেলে চার্চে মন্দ ভিড় ছিল না কিন্তু অধিকাংশই বৃদ্ধ বৃদ্ধা। দু-একটি তরুণ দম্পতিকে যে দেখিনি তা নয়, তবে রুশ তরুণ তরুণীদের জীবনে ধর্মের কোন আকর্ষণই নেই। পার্টি সদস্য হতে গেলে তাঁকে তো নাস্তিক্যবাদে সর্বাগ্রে দীক্ষিত হতেই হয়।

তা সত্ত্বেও পরিণত বয়সে জীবনের সব বিশ্বাসের মূল যখন শিথিল হয়ে যায় তখন আবার ধর্মের কাছেই ফিরে আসে অনেক মানুষ। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যাদের ঐহিক আর কিছু পাবার নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি বড় বড় শহরে আছে ব্যালে ও অপেরা থিয়েটার। রাজধানী শহর হলে একটি করে স্টেট সার্কাস। মস্কো শহরে আছে দুটি বিশালায়তন সার্কাস স্টেডিয়াম।

নভোসিবিরস্কেও রয়েছে সাইবেরিয়ান স্টেট সার্কাস। এরেনাটি অপেক্ষাকৃত ছোট। হাজার দুয়েক লোক বসতে পারে। সুন্দর সুদৃশ্য এরেনা। তবে বিলাসবহুল নয়। রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত দৃষ্টি নেই বলে মনে হল, কারণ শৌচাগারটি দুর্গন্ধময়। লাল কার্পেট পাতা এরেনা। নিচে বালুর চাদর। ওপর থেকে নানা রঙের আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা। বাজনদাররা বসেন একদিকে। আর

তিনদিক ঘিরে দর্শক। বছরে বারো মাস খেলা। আজ শনিবার বলে সমস্ত আসন পূর্ণ, অধিকাংশই এসেছেন বাচ্চা নিয়ে।

রুশ সার্কাসের অভিনবত্ব তার ঘোড়ার খেলায়। চলমান একটি ঘোড়া থেকে আর একটি ঘোড়ায় লাফিয়ে পড়া। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে স্কিপিং করা এ সমস্তই পাকা হাতের কাজ। সব খেলার মধ্যে একটা পরিণত ছাপ চোখে পড়ে। না হলে সার্কাস তো কতগুলি বাঁধাধরা আইটেম ধরেই হয়। জিমন্যাস্টিক, জাগলিং, ব্যালেন্স আর জন্তু জানোয়ার। জন্তু বলতে এখন রুশ সার্কাসে ব্যবহার করা হয় কুকুর আর ঘোড়া। মস্কো সার্কাস নামিয়েছিল দাড়িওয়ালা রামছাগলকে। সে বেচারা তার বুদ্ধিশুদ্ধি অনুসারে শিং বাঁকিয়ে লম্ফঝম্ফ করে দর্শকদের হাসাল। ভারতীয় সার্কাসে বৈচিত্র্য অনেক। শিল্পীদের মধ্যে প্রতিভাবান অনেকেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে নৈপুণ্যের কোন উন্নতি নেই। সেই একই জিনিস প্রতি বছরই আমরা দেখি।

এঁরা সার্কাসের মধ্যে নাচ নিয়ে এসেছেন। এনেছেন গানও। ভারতীয় সার্কাস থেকে সুন্দরী মেয়েরা বহুদিনই অদৃশ্য। কিন্তু রুশ সার্কাসে শিল্পী নির্বাচনে রূপ নিশ্চয়ই একটি বিচার্য বিষয়।

এই সব খেলার মধ্যে বিস্ময়কর লাগল জনৈকা সুন্দরী তরুণীর থট-রিডিং। মহিলা পিছন ফিরে থাকলেন। তাঁর সহকারী দর্শকদের কাছে গিয়ে একের পর এক ব্যক্তিগত জিনিস চাইলেন। আর মহিলাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, এটি কী? মহিলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে লাগলেন। এটি ছাতা, এটি প্লাস্টিক ব্যাগ, এটি পাসপোর্ট। এমনকী পাসপোর্টে যে নাম লেখা আছে সেটি হুবহু বলে দিতে লাগলেন। ল্যাংকিনকে বললাম : কী করে এটা হচ্ছে কিছু বুঝলেন?

ল্যাংকিন বললেন : খেলা দেখবার সময় রুশ ভাষায় বলছিল থট রিডিং। সহকারী প্রথমে জিনিসটি হাতে নিয়ে মনে মনে বলছেন, এটা কী। আর তাঁর মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিচ্ছেন মহিলাটি। তবে যাই হোক অলৌকিক কিছু নয়—এর মধ্যে ফাঁকি একটা কিছু

আছে। তা না হলে হতে পারে না।

থট রিডিং-এর খেলা চোখ বাঁধা অবস্থায় ভারতীয় ম্যাজিসিয়ানরা দেখিয়ে থাকেন। সেটাই একটু অন্যভাবে দেখান হল সার্কাসে। ল্যাংকিন বললেন : ভারতে এমন অনেক লোক আছেন শুনেছি যাঁরা মানুষের মনের কথা জানতে পারেন। কী নেই ভারতে! ভারত বিচিত্র ও মজার দেশ। সব কিছুই আছে সেখানে। চরম প্রাচুর্য, চরম দারিদ্র্য, ঘোর পশ্চিমী জীবনযাত্রা থেকে বিশুদ্ধ ভারতীয় জীবন। বাম উগ্রপন্থী থেকে দক্ষিণ-পন্থী। সব রকম মানুষের মেলা। তাই ভারতকে আমার এত ভাল লাগে।

সার্কাস থেকে হোটেলে ফিরে ডায়রি লিখতে বসলাম। রাত বারোটা নাগাদ ঘুমোতে যাবার আগে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম তখন গোধূলি। রাত্রির আগমনের প্রতীক্ষায় রুপোলি আকাশ তখনও হাপিত্যেশ করে বসে আছে। যেমন করে অনেক রাতে জানলার দিকে চেয়ে বসে থাকে দুশ্চরিত্র স্বামীর সাধ্বী বধূ। মত্ত স্বামী কোন দুপুর রাতে এসে কড়া নাড়বে সেই প্রতীক্ষায়।

ইংলণ্ডে আমি একদা চারটি ঋতু কাটিয়েছি। সেখানে বৃষ্টি আছে কিন্তু বর্ষা নেই। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কনকনে দুরন্ত হাওয়া মানুষকে প্রকৃতি বিমুখ করে তোলে। সাইবেরিয়ায় এসে আমি গ্রাম বাংলার বর্ষাকে কিছুটা ফিরে পেলাম। এ যেন নীল নবঘনে আষাঢ় গগন আচ্ছন্ন। কিন্তু বাংলার সবুজ প্রান্তর জুড়ে সেই মুষলধারে বর্ষণ ইওরোপের কোথাও নেই। সেই যে ধূসর দিগচক্রবাল, আনতশীর্ষ ধান খেতে কুলকুলু ঘোলা জলের বন্যা। মনে পড়ে বৃষ্টির পর আমাদের গ্রামের সুরকির রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হত জলস্রোত। সেই তখন আমাদের কাছে হিমালয় থেকে অঝোর ধারায় নামা মন্দাকিনী। তার স্রোতে ভাসিয়ে দিতাম কাগজের নৌকা। তারপর ধারাস্নিগ্ধ রাতে জানলা দিয়ে ভেসে আসত মত্ত দাদুরির কলতান।

সাইবেরিয়ায় এসে যে বর্ষাকে পেলাম তা যেন আধেক ফিরে পাওয়া, বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা নেই। বর্ষার স্নিগ্ধ আর্দ্রভাবটি ছড়িয়ে

আছে বাতাসে। ন্যাশপাতি গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে পড়ছে শিশির বিন্দুর মত জলের ফোঁটা। রাস্তার এক একটি খাঁজে ঘোলা জল জমে আছে। কিন্তু দুর্যোগ সত্ত্বেও মানুষ বেরিয়েছে পথে। সামনে রুটির দোকানে রুটি কিনবার ভিড়। বাচ্চাদের নিয়ে মা-বাবারা বেরিয়েছে। কারও হাতে ছাতা। কেউ গ্রাহ্য করছে না বৃষ্টির ফোঁটাকে। এই বর্ষণ-সিক্ত রবিবারের সকালে আমাদের যাত্রা পাইয়োনিয়র শিবিরে। শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলের ধারে এই পাইন বনের মধ্যে। বিশ্বের বৃহত্তম এই রেলে চাপার শখ ছিল অনেক দিনের। মস্কো থেকে চলে যেতাম একেবারে জাপান সমুদ্রের তীরে নাখোদকা কিংবা ভ্লাডিভস্টোক পর্যন্ত। ফেরিতে সমুদ্র পার হয়েই জাপান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই পাইয়োনিয়র আন্দোলনটি আমার খুব ভাল লাগে। রাষ্ট্র পরিচালনায় আমার বিন্দুমাত্র বক্তব্য যদি গ্রাহ্য হত তাহলে আমি সর্বাগ্রে আমাদের দেশের শিশুদের জন্য এমন এক আন্দোলনের কথা বলতাম। যা থেকে শিশুরা দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতির মন্ত্রে দীক্ষিত হত এবং শৃঙ্খলাবোধ জাগত তাদের মধ্যে। আমাদের দেশে বয়েজ স্কাউট আছে কিন্তু তা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কিছু ছেলেমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া তার পিছনে না আছে পর্যাপ্ত সরকারি অর্থ সাহায্য, না আছে বেসরকারি অনুগ্রহ।

এদেশে পাইয়োনিয়র শিবিরগুলি পরিচালনা করে ট্রেড ইউনিয়ন। প্রত্যেকটি বড় কারখানার নিজস্ব ক্যাম্পিং এরিয়া আছে। আমরা যে শিবিরে গেলাম সেটি মেশিন টুলস কারখানার পাইয়োনিয়র শিবির। চার হাজার কর্মী কাজ করেন ওই কারখানায়। তাঁদের ছেলেমেয়েরাই আসে এই শিবিরে। গত ২৫ বছর ধরে এখানে শিবির চলছে। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক ফাদেয়-এর 'ইয়ং গার্ড' উপন্যাসের তরুণ নায়ক সিরগে চুলিনিনের নামে এই শিবির। চুলিনিন বাস্তব চরিত্র। তরুণ সেনাদের নিয়ে তিনি ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। চুলিনিনের প্রিয় বান্ধবী ভেলেরিয়া এখনও জীবিত। বৃদ্ধা কাছাকাছি কোথাও থাকেন।

মাঝে মাঝে শিবিরে আসেন। চুলিনিনের এক বিরাট স্টাচু আছে এই শিবিরে।

শিবিরে ঢোকার মুখে দেখলাম কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সেনট্রির ডিউটি করছে। আমাদের আসার খবর দেওয়া ছিল আগে থেকেই। গেটের মুখে অভ্যর্থনা জানালেন আন্না পাভলোভা কোরলেব্‌ভা, বয়স্ক ভদ্রমহিলা। অধিকাংশ রুশ মহিলা পঁয়ত্রিশ পেরুলেই মেদ সঞ্চয় করেন। ইনিও তেমনি স্থূলকায়া। ওই মেশিন টুলস কারখানার টেকনিসিয়ান ইঞ্জিনিয়র। গত সাত বছর ধরে স্কুল ছুটির সময় এই ভদ্রমহিলাই শিবির পরিচালনা করেন।

জুন মাস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্কুল ছুটি পড়ে যায়। তিন মাস ছুটির পর স্কুল খোলে আবার সেপ্টেম্বরে। তখন নতুন ক্লাস শুরু হয়। সেটা যেন জাতীয় উৎসব। শহরে বড় বড় করে ফেষ্টুন পড়ে স্বাগত হে ছেলেমেয়েরা। তোমাদের নতুন ক্লাস সুখের হোক। তার আগে বই খাতা ব্যাগ কেনবার জন্য ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলিতে ভিড় হয় প্রচণ্ড। এই তিন মাস ধরে সর্বত্র চলে পাইয়োনিয়র ক্যাম্প। এই পাইয়োনিয়র ক্যাম্প এক মাস করে চলে তিন দফায় তিন মাস। প্রতি ক্যাম্পে এক হাজার করে ছেলেমেয়ে আসে যাদের বয়স সাত থেকে তেরো, অর্ধেক ছেলেমেয়েকে এজন্য টাকা পয়সা কিছু দিতে হয় না। বাকি অর্ধেকের কাছ থেকে মাত্র ৫ রুবল করে নেওয়া হয়। আন্না বললেন : আমাদের শিবিরে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজেদের কাজ করে। এমনকী শৌচাগার সাফাই পর্যন্ত। শ্রমের মর্যাদা শেখানর জন্যই এই ব্যবস্থা। ঠিক গান্ধীজীর নঈ তালিমের মত। সেখানে কেতাবি শিক্ষার চেয়ে ছেলেমেয়েদের শ্রম শিক্ষণ দেওয়াটাই ছিল বড় কথা।

শিবির ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন আন্না : নতুন মানুষের গন্ধ পেয়ে একদল মশা তেড়ে এল ড্রাকুলার মত। ল্যাংকিন আমাকে করুণ সুরে তাঁর বাংলায় বললেন : শালারা আমায় কাল রাতে খুব কেটেছে। এই দেখুন, নতুন মানুষ দেখে এখানেও ছুটে আসছে। কলকাতার মশাকেও

এরা হার মানিয়ে দিল।

এই মশার আক্রমণ থেকে কিভাবে বেঁচে আছে কচি কাঁচারা? লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম আন্নাকে। আন্না বললেন, এরকম তেল আছে, মুখে ও হাতে মেখে নিলে মশারা পালায়।

আমরাও সেই তেল মেখে নিলাম ভাল করে। সত্যি, মশাকে দূরে রাখার এমন মহৌষধ আছে বলেই এই জঙ্গলে মহা সুখে কাজ করছে ছেলেমেয়েরা।

আন্না বললেন : ক্যাম্পে বাচ্চাদের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। এখানে তাদের জন্য গরম জলের সুইমিং পুল আছে। জুতো শুকোবার ঘর আছে। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জুতো ভিজে যায় সারা দিন। রাতে রেখে দিলেই শুকিয়ে যায়, ফোয়ারা আছে বাচ্চাদের লাফালাফি করে স্নানের জন্য। আছে ভিডিও গেমসের ব্যবস্থা। ইলেকট্রিক ট্রেন, ট্রলি বাস, জাহাজ চালাবার জন্য খেলাঘর। ট্রাফিক রুলস শেখাবার জন্য স্টেডিয়াম। ফুটবল-ভলিবল মাঠ।

ছেলেমেয়েরা সকাল ৮ টায় ঘুম থেকে ওঠে। তারপর একটু ব্যায়াম করে শোবার ঘর সাফ করে। প্রাতঃকৃত্য সেরে ৮টা ৪৫-এর সময় পতাকাদণ্ডের সামনে জড়ো হয়। সেখানে সেদিনের রুটিনের কথা বলা হয়। নটার সময় ব্রেক ফাস্ট। ব্রেক ফাস্টে দুধ, গ্রীয়েচকা (ডালের মত খাবার) ডিম, মাখন ও রুটি। লাঞ্চ আসে দেড়টায়। স্যুপ, আলু আর মাংস। এরপর সাড়ে চারটেয় কেকের মত মিষ্টি রুটি ও চা। সাড়ে আটটায় ডিনার আলু, মাংস, রুটি, মাখন ও গরম দুধ।

সকালে কাজ। নানা রকমের কাজ থাকে তার মধ্যে। হাতের কাজ, গৃহস্থলীর কাজ থেকে কোন খামারে চাষীদের সাহায্য করার কাজ পর্যন্ত। দুপুরে ২টা ১৫ থেকে ৪টা পর্যন্ত ছোটদের ঘুম। বড়রা সে সময় শুয়ে শুয়ে রেডিও শোনেন। সন্ধ্যায় খেলাধূলা-নাচ-গান। আমরা যখন গেলাম তখন মাইকে ছোটদের গান বাজছিল। ছেলেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা কাজে। শিবির সম্পর্কে পরিচিতি দেবার পর ঘর থেকে বখন বাইরে নিয়ে গেলেন আন্না তখন দেখি ছেলেমেয়েরা

দু সারি দিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে আমাকে গার্ড অব অনার দিচ্ছে। আমি মাঝখান দিয়ে ভি আই পি-র মত যাচ্ছি : আর তারা বলছে

ইণ্ডিয়া-রুশী ভাই ভাই।

ওদের মিউজিক শিক্ষক পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাতে লাগলেন. ছেলেমেয়েরা গাইতে লাগল ক্যাম্প সঙ্গীত। প্রত্যেকটি গ্রুপের আবার আলাদা আলাদা করে সঙ্গীত আছে।

সমবেত সঙ্গীতের মত এত অনুপ্রেরণা আর কোন কিছুতে অনুভব করা যায় না। আমি ভাষা জানি না কিন্তু শুধু সুরেরও একটা আবেদন আছে। সমবেত শিশু কণ্ঠে সেই উদাত্ত সুর পাইন গাছের মর্মর ধ্বনির সঙ্গে মিলেমিশে এক উন্মাদনা সৃষ্টি করল আমার মনে। সেই মুহূর্তে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মত আমিও যেন জগৎ পারাবারের তীরে সমস্ত শিশুকে এক লহমায় প্রত্যক্ষ করলাম। এক একটি মুহূর্ত আসে জীবনে যখন সময় ও গতির সীমানা মুছে যায়। মানুষ যে কোন শাশ্বত কালে গিয়ে পৌঁছে যায়, যেখানে কারও বয়স নেই, জাতি নেই, বর্ণ নেই, ভাষা নেই।

: এইবার আপনি ওদের কিছু বলুন।

ল্যাংকিনের এই কথায় আমার চমক ভাঙল। আমি বাংলায় বললাম : আমার ছোট ছোট বন্ধুরা, ভারতের ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে তোমরা আমার অভিনন্দন নাও। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই দেশের মধ্যে মিত্রতার যাত্রা শুরু করে গিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু। এরপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সে সম্পর্ক দৃঢ় করে যান। তোমরা জান রুশীরা তাঁকে কত ভালবাসতেন। তিনিও রুশীদের কত ভালবাসতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কিছুদিন আগে রাজীব গান্ধী তোমাদের দেশে ঘুরে গেলেন। তোমাদের মত আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও শান্তি চায়। আমাদের লক্ষ্য এক আমি তোমাদের কথা আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে দেব।

ল্যাংকিন রুশী ভাষায় আমার বক্তৃতা তর্জমা করে দিলেন। ছেলে-মেয়েরা হাততালি দিল খুব। একটি মেয়ে এসে তিনটি শাপলা ফুল

আমার হাতে দিয়ে বলল : আমাদের উপহার। আর একজন মেয়ে একটি চকলেট এনে দিল আমাকে।

ছেলেমেয়েরা খুবই ভদ্র। গ্রাৎসে, পাশিবা অর্থাৎ ধন্যবাদ ছাড়া মুখে কথা নেই। বাংলা বক্তৃতা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল সবাই। আমারই লজ্জা করছিল রাজনৈতিক নেতার মত একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম বলে। হয়তো আর একটু লঘু ভাষায় গল্প বলার ছলে কিছু বলতে হত। কিন্তু চোর পালালে তার বুদ্ধি বাড়ে।

আন্না আমাদের না খাইয়ে ছাড়লেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে দেখছি কোন ইনস্টিটিউশনে গিয়ে না খেয়ে উপায় নেই। বিশেষ করে এই এশিয়ায়। অতিথেয়তাই এখানকার ট্র্যাডিশন।

খেতে খেতে আন্না বললেন : পাইয়োনিয়র ক্যাম্পের একটা সুবিধে আমরা ছোটদের জন্য যাদের কাছে যা কিছু চাই কেউ না করে না। প্রতি বছর নভোসিবিরস্কে নামী নাটকের দল আসে। আমরা তাদের বলি পাইয়োনিয়রদের জন্য শো দেখিয়ে যান। তাঁরা অত কাজের মধ্যেও না এসে পারেন না। আমাদের কারখানার ডাইরেক্টররাও বোঝেন এই পাইয়োনিয়র ক্যাম্প কারখানা পরিচালনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ মজদুররা যখনই বোঝেন যে কারখানা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জন্যও চিন্তা করছে তখন তাঁরা বেশি করে উৎপাদনে মন দেন।

পাইয়োনিয়র শিবির হয় বছরে তিন মাস। বাকি সময়গুলো এই শিবির শ্রমিকদের বিশ্রাম কুটির হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কোলস বিশ্রাম কুটির

বিশ্রাম কুটির বা পেনসিয়ানাৎ আমাদের দেশের হলি ডে হোমের মত। তবে ব্যবস্থা এখানে আরও রাজকীয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে মজুররাই নব্য এলিট শ্রেণী। মজদুর ও বিজ্ঞানীরাই এদেশে বেশি রোজগার করেন। নভোসিবিরস্ক থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে একটি পেনসিয়ানাৎ দেখতে গিয়েছিলাম। দশটি রুটি তৈরি কারখানার

শ্রমিক ইউনিয়ন মিলে ওব নদীর ধারে পাইন জঙ্গলের মধ্যে এক মনোরম পরিবেশ এই বিশ্রাম কুটি তৈরি করেছে। হলি ডে হোমটির সমস্ত কমপ্লেক্স কাঠ দিয়ে তৈরি। কিন্তু এর পিছনে আছে অনুপম শিল্পকলা। কাঠ খোদাই করে করে বিচিত্র কারুকার্য করা হয়েছে সিলিং-এ ও দেওয়ালে। মাটিতে কার্পেট। ওপরে সুদৃশ্য ঝাড়লণ্ঠন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থা ভিতরে।

নভোসিবিরস্ক ছাড়ালেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গল মানে অবিন্যস্ত ঝোপঝাড় নয়। বোঝা যায় তার পিছনে আছে সামাজিক বন সৃজনের পরিকল্পিত প্রয়াস। সাইবেরিয়া বলতে যে রুক্ষ বন্ধ্যা বরফ ঢাকা প্রান্তরের ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে সে ছবি কে ধরিয়ে দিয়েছিল কে জানে। সাইবেরিয়া মানেই যেন নির্বাসিতের আর্তনাদ। যেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ছবি। কিন্তু এ যে দেখি এক উদার উধাও পৃথিবী সবুজ ডানা মেলে নীল আকাশে উড়ে যেতে চায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহৎ শহরের নাম নভো-সিবিরস্ক। নদী আর অরণ্য এক সঙ্গে এসে মিশেছে তিনটি থিয়েটার, একটি অপেরা হাউস এই শহরে। ৫২ কিলোমিটার আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল হচ্ছে। ট্রাম, ট্রলি, বাস, বাস চলছে। বড় বড় বাড়ি, অ্যাপার্টমেণ্ট। অথচ এত বড় শহরে কোন জনকোলাহল নেই। ঠিক প্রকৃতির নির্জনতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলছে শহরের জনজীবন।

জাইয়েল সোস্কি বোর বিশ্রাম কুটির শহরের যে এত কাছে এই অরণ্যে ঢুকলে মনেই হয় না, অথচ সামনের মসৃণ পিচ ঢালা রাজপথ দিয়ে প্রতি বিশ মিনিট অন্তর বাস যাচ্ছে। শীতকালে ৬০ ও গ্রীষ্মকালে ৮০ জন থাকতে পারে এই বিশ্রাম কুটিরে। শ্রমিকরা সাধারণভাবে আসেন উইক এণ্ডে। অসুস্থ হয়ে পড়লে আরোগ্য নিকেতন হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তখন ২৪ দিন থাকা যায় সপরিবারে। শ্রমিকদের এজন্য দিতে হয় মাথা পিছু দিনে এক রুবল। মাথা পিছু পাঁচ রুবল করে সাবসিডি দেয় ট্রেড ইউনিয়ন। কোলস হলি ডে হোমের ডেপুটি ডাইরেক্টর আয়োসেফ সোলুডুখিন আমাদের

ঘুরে ঘুরে দেখালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ধরনের অসুখে এখানকার লোকেরা বেশি ভোগেন ? কোন অসুখের নিরাময়ের জন্য এখানে আসেন ?

সোলুড়ুঝিন রুশ ভাষায় যা বললেন, সেটা বাংলায় তর্জমা করে দিলেন ল্যাংকিন : হৃদ রোগের জন্য আর পেটের অসুখের জন্য পাইন গাছের হাওয়া খেতে লোকে এখানে আসেন।

সাইবেরিয়ায় রোদ্দুর

সাইবেরিয়াতে কীরকম শীত পড়ে সেটা বোঝা যায় শহরের হিটিং যন্ত্র কত দিন চলে তার পরিসংখ্যান দিয়ে। উত্তর সাইবেরিয়ায় হিটিং চলে বছরে ২৯০ দিন। নভোসিবিরস্কে হিটিং চলে ২৪০ দিন। একদম উত্তরে চলে ৩৬০ দিন। শীত পড়তেই বিস্তীর্ণ বরফে বহু এলাকা ঢেকে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জনপদ। তাই গ্রীষ্মের জন্য সাইবেরিয়ার মানুষ সারা বছর হাপিত্যেশ করে চেয়ে থাকে। শীত যাই যাই করেও এবার কিছুতেই গেল না বলে আমাকে অনেকে বললেন : তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। অন্য বছর জুন জুলাইতে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত ওঠে। এবার কিন্তু এখনও বারো থেকে চোদ্দ। যদি রোদ্দুর ওঠে তাহলে শীত কমবার সম্ভাবনা আছে।

একটু উষ্ণতার জন্য মানুষের প্রার্থনা সফল হল। আমি থাকতে থাকতেই দুদিন রোদ্দুর পেয়ে গেলাম। আর রোদ্দুর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছুটির আমেজ শুরু হয়ে গেল। বাচ্চাদের নিয়ে মা বাবারা বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়। ছিপ হাতে মাছ ধরতে যাচ্ছে স্কুলের ছেলেরা। পায়ে চাকা লাগিয়ে স্কেটিং করছে বাচ্চারা।

পার্ক আর স্কোয়ারে ভর্তি শহর। ফোয়ারা থেকে অনর্গল উৎসারিত হচ্ছে জলধারা। বিরাট বিরাট চওড়া রাস্তা। সোভিয়েত ইউনিয়নে চওড়া রাস্তার নাম প্রসপেক্ট।

নভোসিবিরস্কে রয়েছে ক্রাসনি প্রসপেক্ট, সাইবেরিয়ান নভোচারী ঘেরম্যান টিটভের নামে ঘেরম্যান টিটভ প্রসপেক্ট। সাইবেরিয়ান ওয়ার

হিরো মনুমেন্টে স্টানিস্লভস্কি প্রসপেক্টে জ্বলছে অনির্বাণ মশাল। নভোসিবিরস্কের সিটি অফিসে এই শহরের উপ অধিকর্তা আমাকে শোনাচ্ছিলেন সাইবেরিয়ায় বন কেটে বসতের কথা। ১৯২১ সালে এই শহরের বয়স একশো বছর হবে। ১৯০৩-২২ সালে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার। উনিশ শতকে দুর্গম সাইবেরিয়াকে জয় করতে করতে এগিয়ে আসেন ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলের কর্মীরা। অবশ্য সাইবেরিয়ার সভ্যতা অনেক প্রাচীন। কিন্তু এতদিন সেখানে বাস ছিল আদিবাসীদের, ধর্মীয় নিপীড়নের ভয়ে পলাতক কিছু মানুষের আর নির্বাসিতের। রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এই বিরাট ভূখণ্ড তার জঠরে অফুরন্ত ধন ভাণ্ডার নিয়ে মানুষের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে পৃথিবীর আর এক আশ্চর্য। জারের আমলে উনিশ শতকের শেষভাগে পাহাড় বন খরস্রোতা নদী জয় করতে করতে রেল কর্মীরা এগিয়ে চলছিলেন পূর্বদিকে। দুরন্ত ওব নদীর সামনে এসে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল কোনিভান গ্রামের কাছে তাঁরা সেতু তৈরি করবেন। কিন্তু সেখানে দেখা গেল নদী দশ থেকে বারো কিলোমিটার চওড়া। এই রেলকর্মী দলের হেড সার্ভেয়র ছিলেন এন গারিন মিখাইলোভস্কি। পেশায় ইঞ্জিনিয়র কিন্তু নেশায় ঔপন্যাসিক। গারিন দেখলেন কোনিভান থেকে যদি আর একটু সরে এসে কামেঙ্কা নদীর মোহনার কাছে সেতু করা যায় তাহলে বর্ষাকালে নদী অত প্রমত্তা হবে না, কারণ সেখানে আছে ভারি ভারি পাথরের প্রতিবন্ধকতা। গারিনকে কোনিভানের ব্যবসায়ীরা অনেক করে বোঝালেন ব্রিজ ওঁদের গ্রাম থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেতে। এমনকী প্রচুর টাকার লোভও দেখালেন। কিন্তু গারিন তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে নড়লেন না। কামেঙ্কা আর ওব নদীর মোহনায় ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলের সেতুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেদিনের শহর নভোনিকোলায়েভস্ক। ১৯২৬ সালের পর যার নাম হল নভোসিবিরস্ক।

১৯১৭ সালে বিপ্লবের সময় নভোসিবিরস্কে ৭০ হাজার মানুষ এসে

গেছে। কাঠের ব্যবসা ও কিছু কিছু মাইনিং এই ছিল উপজীবিকা। শতকরা ৮০ জনই ছিল নিরক্ষর। আধুনিকতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না তাদের জীবনযাত্রায়। বরং মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে থাকায় এই এলাকার মানুষ ছিল প্রগতি বিমুখ। মস্কো থেকে নভোসিবিরস্ক ট্রেনে আসতে চার পাঁচদিন লাগলেও বিপ্লব এখানে আসতে লেগেছিল আরো দুবছর। বলশেভিকদের তাড়া খেয়ে প্রতিবিপ্লবীদের অনেকেই চলে এসেছিল এখানে। হোয়াইট গার্ডদের ছিল নিদারুণ আধিপত্য। স্থানীয় কম্যুনিস্ট ও বিপ্লবের জন্য নিবেদিতপ্রাণ বহু মানুষকে এখানে জেলে পুরে রাখা হয়েছিল। জেলের মধ্যেই তাদের হত্যা করা হয়। তাদের যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেটি এখন সুন্দরভাবে সাজান সমাধি সৌধ। ১৯১৯ সালে লাল ফৌজ এখানে প্রতিবিপ্লীদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়।

সাইবেরিয়ার অভ্যন্তরে যে প্রাকৃতিক ভাণ্ডার রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে তার ব্যবহার হতে থাকে বিপ্লবের পরেই। ওব নদীর দুই তীরে নভোসিবিরস্ক শহর বাড়তে থাকে। কারণ এই শহরের কাজেই কুজনিয়েস্ক অঞ্চল, যেখানে আছে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা। আছে লোহা। কাছে আলতাই অঞ্চলের জমিও উর্বরা। অতি অল্প সময়ের ভেতর নভোসিবিরস্ক গড়ে উঠতে থাকে এক শিল্প নগরী হিসাবে। কুজনিয়েস্ক অঞ্চলের খনিজ সম্পদ তোলার জন্য দরকার খনি যন্ত্রপাতি। আর খনি যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য চাই যন্ত্র। যন্ত্রের জন্য কারখানা তৈরি হল নভোসিবিরস্কে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নভোসিবিরস্কে আর এক দফা উন্নতি শুরু হয়। সাইবেরিয়া রণক্ষেত্র থেকে দূরে। লেনিনগ্রাদ শত্রুর দখলে। তার আগেই লেনিনগ্রাদ থেকে বহু কলকারখানার মেশিনপত্র খুলে নিয়ে আসা হয় নভোসিবিরস্কে। কারখানার সঙ্গে আসেন কর্মীরা। ১৯৪১ সালে এক মাসে ৯০টি কারখানা চলে এসেছিল এই শহরে। তারপর যুদ্ধের পর আবার উন্নয়নের ঢেউ আসে নভোসিবিরস্কে। আজ ৩০০টি বড় বড় কারখানা আছে এই শহরকে ঘিরে।

যুদ্ধের সময় নারী-শিশু-বৃদ্ধ মিলে প্রায় ত্ত লক্ষ লোক ইভাক্যুয়েট করেছিলেন এই শহরে। সে সময় প্রচণ্ড সংকট ছিল গৃহের। প্রত্যেকটি লোকের জন্য মাথা পিছু মাত্র সাড়ে চার মিটার করে জায়গা ছিল। যুদ্ধের সময় শুধু কারখানা আর মানুষ নয়, ত্রেটায়াকভস্কির সমস্ত মূল্যবান ছবিও নিয়ে আসা হয় এই শহরে। নভোসিবিরস্কের উন্নতির তৃতীয় পর্যায় শুরু ১৯২১ সালের পর থেকে। এই দশকে নভো-সিবিরস্কে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউ এস এস আর বিজ্ঞান আকাদমির শাখা।

সিটি অফিসে বসে দো-ভাষীর মারফৎ নানা কথা হচ্ছিল এইচ এ আলিজানোভের সঙ্গে। তিনি এই শহরের এগজিকিউটিভ কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই শহরের অধিকাংশ মানুষ যেমন এসেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা থেকে তেমনি আলিজানোভ এসেছিলেন ককেশাস অঞ্চল থেকে। আলিজানোভ বলছিলেন, প্রকৃতি এখানে কঠোর বলেই মানুষ এখানে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতাশীল। অদক্ষ ও ফাঁকিবাজ লোকদের স্থান নেই সাইবেরিয়ায়। কারণ একমাত্র খাঁটি লোকরাই থাকতে পারে প্রকৃতির এই প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে।

আমার প্রশ্ন : প্রকৃতির বিরুদ্ধে এখানকার মানুষ সংগ্রাম করছে। পরিণামে কে জিতছে—মানুষ, না প্রকৃতি ?

আলিজানোভ জবাব দিলেন : নিঃসন্দেহে মানুষ। আমরা সারা বছর ধরে খোলা হাওয়ায় কাজ করছি। ধরুন কনস্ট্রাকশনের কাজ, রাস্তার কাজ, জমির কাজ, এ তো সারা বছর ধরে খোলা জায়গায় করতে হয়। জুন থেকে আগস্ট এই কটি মাস শুধু গ্রীষ্ম। আমরা ঠাট্টা করে বলি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এই কটা মাস শীতকাল, বাকি সব গ্রীষ্মকাল। আমাদের কাজ তো থেমে থাকে না। শুধু মাইনাস ৫০ ডিগ্রির সময় বাচ্চাদের স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রচণ্ড শীতে টমাটোর চাষ হচ্ছে। আপেল হচ্ছে।

: আপনাদের শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে কীরকম হারে ?

: প্রতি বছর ২০ থেকে ২২ হাজার করে বাড়ছে। এর মধ্যে বেশ

কিছু বৃদ্ধি হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে। তবে প্রতি বছরই অনেক তরুণ আসছে চাকরি নিয়ে। সাইবেরিয়ায় চাকরি করলে শতকরা ১৫ থেকে ১০০ ভাগ অতিরিক্ত ভাতা পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও আমাদের কাজের তুলনায় লোক কম। আমরা আরও লোক চাই। কিন্তু লোক পাব কোথায় ?

অতিরিক্ত লোকের জন্য আমরা থাকার জায়গা বাড়িয়েছি। এখন এই শহরে মাথাপিছু থাকার জায়গা ১২.৩ বর্গ মিটার। প্রতি চারদিন অন্তর একটি করে ন তলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

: যারা নতুন এই শহরে আসছে, আসার সঙ্গে সঙ্গে কি ফ্ল্যাট পেয়ে যাচ্ছে।

: সবাইকে এক সঙ্গে ফ্ল্যাট দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমে যারা আসছে তাদের আমরা হস্টেল অ্যাকোমোডেশন দিচ্ছি। তারপর তাদের কাজের গুরুত্ব বুঝে ফ্ল্যাট বণ্টন হচ্ছে। নভোসিবিরস্ক শহরের ঐতিহ্য হল এখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্থানীয় শিল্পের এক গভীর যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট সময় কারখানায় গিয়ে কাজ শেখে। শুধু তাই নয়, তারা প্রতি বছর ১০ লক্ষ রুবলের মত উৎপাদনও করে। মেয়েরা বাচ্চাদের জামাকাপড় তৈরি করতে শেখে। এতে যে টাকা আয় হয় সেই টাকা দিয়ে বাচ্চাদের গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন ট্যুরে নিয়ে যাওয়া হয়।

নভোসিবিরস্ক শহরে আমি যে কদিন ছিলাম রাস্তায় বাসের ঘাটতি দেখিনি। বাস, ট্রলি বাস ও ট্রাম আছে এই শহরে। অফিস টাইমে লোকে দাঁড়িয়ে গেলেও আমি কাউকে ঝুলতে দেখিনি। কিন্তু ডেপুটি সাহেব বললেন : আমাদের দেড় হাজার বাস ও ট্রাম আছে। তাতে কুলোচ্ছে না। আমাদের ৫২ কিলোমিটার মেটরো রেলের কাজ শুরু হয়েছে। এই বছর আংশিকভাবে মেট্রো রেল চালু হবে। ওব নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু তৈরি হচ্ছে মেট্রোর জন্য। প্রথম পর্যায়ে ১৫০ মিলিয়ন রুবল অর্থাৎ ১৯৫ কোটি খরচ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ১০০ মিলিয়ন রুবল খরচ হবে। সমস্ত টাকা দিচ্ছেন

কেন্দ্রীয় সরকার।

নভোসিবিরস্কের বার্ষিক বাজেট কত একথা বলতে চাইলেন না আলিজানোভ। বললেন: আমাদের শহরে এই নিয়ম করা হয়েছে শহরের প্রত্যেকটি মানুষের মেডিকেল চেক-আপ হবে ফি-বছর। এছাড়া আমরা সাইবেরিয়া প্রজেক্ট নিয়েছি। এর উদ্দেশ্য কী করে এখানকার মানুষের স্বাস্থ্য ভাল করা যায়। শীতকালীন স্পোর্টস, জগিং ইত্যাদি ব্যাপারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন: শহরের আয় কী? পুঁজিবাদী দেশে সম্পত্তি থেকে কর হল প্রধান আয়। কিন্তু এদেশে তো সম্পত্তি কর নেই। পুরসভাগুলি চলে কীভাবে"

উত্তর পেলাম: শিল্পগুলি সরকারকে যে কর দেয় তার একটা অংশ আমাদের এই পুরসভাকেও দেয়। জনগণকে কোন কর দিতে হয় না। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে বাসের ভাড়া এখনও ৫ কোপেক। এদেশে ট্রাম-বাসের ভাড়া বাড়ে না। তা সত্ত্বেও এখানকার বাস লাভ করে। তবে মেট্রো রেল হয়ত প্রথম প্রথম লোকসানে চলবে।

(১ কোপেক ১৫ পয়সা)

পুরসভার নিজস্ব আয় বাড়াবার জন্য কিছু শিল্প হাতে আছে। যেমন সিরামিক কারখানা, মেটাল ও প্লাস্টিক কারখানা।

: এ দেশে পুলিশ কাদের হাতে?

: পুরসভারই হাতে।

: কোন কোন অপরাধ বেশি হয়?

বড় অপরাধ হয় না বললেই চলে। হবার মধ্যে হয় চুরি। শতকরা ৯৫ ভাগ কেসে চোর ধরা পড়ে। তবে চুরি বন্ধ করার জন্য আমরা নাগরিক রক্ষীবাহিনীর পত্তন করেছি। ফলাফল খুবই ভাল।

কারখানা পরিদর্শন

সিবলিট মাস একটি মেলটিং মেশিন তৈরির কারখানা। ওব নদীর ওপারে এই কারখানাটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ ছিল।

কারখানার ডিরেক্টর নিজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দেখালেন। ভদ্রলোক নতুন ডিরেক্টর হয়েছেন। কারখানার ডিরেক্টর অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ পদ। সাধারণত পার্টির সদস্যরা এই পদ পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে পাবলিক সেক্টর কারখানা কর্তৃপক্ষের লাভ লোকসানের কোন দায় নেই। লাভ হলে হল, না হলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি নির্ভর করছে এই সব রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানার ওপর। ওদেশে সব কিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত। তাই লোকসান মানে সর্বনাশ। কোন কারখানায় লোকসান হলে ডিরেক্টরকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। একবার অপারগতার দায়ে চাকরি গেলে ডিরেক্টরকে হয়ত সাধারণ মজদুরের চাকরি নিতে হতে পারে।

আমি যে কারখানাটিতে গেলাম সেটি ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত। তিন হাজার লোক সেখানে কাজ করেন। প্রতি বছর ৩০ মিলিয়ন রুবল মূল্যের মাল তাঁদের তৈরি করা চাই। সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পিত অর্থনীতি। পাঁচবছরের জন্য কে কত উৎপাদন করবে তার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে।

ডিরেক্টর বললেন: প্রতি বারেই শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ৪ থেকে ৫ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বাড়ানর জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটর কেনা হয়েছে। আমি কারখানা ঘুরে দেখলাম মেশিন তৈরির সমস্ত প্রক্রিয়াই স্বয়ংক্রিয়।

সোভিয়েত দেশে কারখানায় একটা জিনিস খুব ভাল লাগল। কারখানার ভেতর গিয়ে দেখি প্রত্যেকটি শপে শ্রমিকদের ছবি টাঙান। যাঁরা ভাল কাজ করেন তাঁদের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি শ্রমিকের উৎপাদন লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া আছে। সেগুলি নোটিস বোর্ডে লেখা থাকে। উৎপাদন লক্ষ্যের চেয়ে কে কত বেশি উৎপাদন করল তারই প্রতিযোগিতা চলে। ল্যাংকিন সাহেব আমাকে বললেন, একে বলে সোসালিস্ট কম্পিটিশন। কারখানার শপের মধ্যে প্রতিযোগিতা। তারপর বিভিন্ন কারখানার মধ্যে প্রতিযোগিতা। সারা রিপাবলিকের যাঁরা দক্ষতম কর্মী বলে বিবেচিত হন তাঁদের হিরো আখ্যা দেওয়া হয়। নভোসিবিরস্কের স্কোয়ারে এইসব হিরোদের ছবি টাঙান আছে।

এদেশে কৃষক ও শ্রমিককে আরও বেশি উৎপাদন করার জন্য যে উৎসাহ দেওয়া হয় সেটা অনেক বড় ব্যাপার। কেউ যদি বোঝে তার প্রতিটি কাজকর্ম হয় পুরস্কৃত হবে, না হয় তিরস্কৃত হবে তাহলে সেই অনুসারে মানুষ কাজ করে। কিন্তু আমাদের দেশে চাকরিতে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা অনেকখানি। এখানে কোন শিল্পে দুটো ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারে না। প্রত্যেকটি শিল্পের আলাদা করে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আছে। ফ্যাক্টরি ইউনিয়ন তার শাখা। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য হলি ডে হোম তৈরি করে। তারাই সুপারিশ করে কর্মীদের পাঠায়। একজন হিরোকে ছুটি কাটাতে পাঠান হবে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অথবা কৃষ্ণ সমুদ্রে। তার যাতায়াত থেকে থাকা খাওয়া সব কিছু হয় ফ্রিতে, না হয় নামামাত্র মূল্যে।

ডিরেক্টর বললেন : প্রতি বছর মজুরদের উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ করে বাড়ছে। তবে তাঁর সমস্যা প্রয়োজন-মত লোক নেই কারখানায়। ওভার টাইম করে পুষিয়ে নেওয়া যায় না। কারণ মাসে ১২ ঘণ্টার বেশি কাউকে ওভারটাইম করান যায় না।

ট্রেড ইউনিয়নই আসলে এদেশে কারখানা চালায়। নিয়োগ ও ছাঁটাই ট্রেড ইউনিয়নের বিনা অনুমতিতে হতে পারে না। প্রশ্ন ছিল : ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে প্রশাসনের কোন বিরোধ আছে কি ?

উত্তর হল, নেই।

ফ্যাক্টরি শপে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম একজন প্রবীণ কর্মীর ছবির সঙ্গে কিছু তরুণ কর্মীর ছবি। ডিরেক্টর বললেন : এখানে এক একজন প্রবীণের হাতে বেশ কিছু তরুণ শিক্ষার্থী দেওয়া হয়। এগুলো তাঁদের ছবি। তোকারিয়েভ বলে এক মজদুরের ছবি দেখলাম, তিনি পাঁচ বছরের মধ্যে তিনজন তরুণ শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে দিয়েছেন। সোভিয়েত দেশে কারখানার শ্রমিকরা সবচেয়ে সুবিধা ভোগ করেন।

তুলনামূলকভাবে তাঁদের বেতন বেশি। সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট। ওদেশে প্রত্যেক কল-কারখানা শনি-রবিবার বন্ধ। কারখানার ভেতরে আমরা ঘুরলাম অনেকক্ষণ। ৫০ টন ওজনের এক একটি মেশিন তৈরি করতে দাম পড়ে ৮ লক্ষ রুবল। কিন্তু যন্ত্রপাতি সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করা দরকার।

শপের ভেতরে লেনিনের ছবি দেখা গেল দেওয়ালে। উৎপাদন বাড়াবার জন্য আহ্বান, শ্রমিক পঞ্চবার্ষিকী যোজনা সফল করার উদ্দেশ্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত কর্মপদ্ধতিই ছাঁচে ঢালা। এমনকী নগর পরিকল্পনার মধ্যে কী কী থাকবে তাও নির্ধারিত। একটি শহর দেখলেই বলে দেওয়া যায় অন্য শহরে কী কী আছে। জিনিসপত্রের দাম সর্বত্র এক। স্থানীয় কর বলে কোন বস্তু নেই। সারা দেশ জুড়ে ট্রাম বাস ও মেট্রো রেলের ভাড়া এক। স্কুলের পাঠক্রম এক। জাতিগত ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষাও এক। বড় বড় কলকারখানা থেকে শুরু করে কোথায় রাস্তার ধারে কিয়স্ক বসবে তাও পরিকল্পনামাফিক নির্ধারিত। এমনকী কত উৎপাদন হবে এবং একজন শ্রমিককে কত উৎপাদন করতে হবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যাশা সুনির্দিষ্ট। সেই প্রত্যাশা পূরণ করলে রাষ্ট্র ও সমাজ সেই ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তার কর্তব্য পালন করবে। এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। কাজ না করার কোন অধিকার কারও নেই। সঞ্চিত অর্থের সুদে কিংবা অপরের শ্রমে ভাগ বসিয়ে খাবার কোন উপায় নেই। ভবঘুরে হয়ে বেড়িয়ে ভিক্ষা করে খাবার উপায় নেই কারও। এক সময় ভাবা গিয়েছিল প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনই সমাজতন্ত্রের শেষ কথা। কিন্তু এখন নূ্যনতম প্রয়োজন মিটিয়ে আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে বণ্টনের নীতি স্বীকৃত। সমস্ত মানুষের নূ্যনতম চাহিদা এক, কিন্তু যোগ্যতার দিক থেকে সব মানুষ সমান হতে পারে না। কেউ অতিমাত্রায় পরিশ্রমী, কেউ অতিমাত্রায় কুশলী, কেউ কেউ প্রতিভাবান, সবাই নয়। কাজেই বণ্টনের ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সম্পদ দিলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনেরই ক্ষতি হবে, কেন না

এতে ব্যক্তি উৎসাহে ভাঁটা পড়বে। মুড়ি মিছরির একদর যে সাম্য নয় তা এদেশের সমাজতন্ত্রী নেতারা বুঝে উঠেছেন বলেই বেতনের ক্ষেত্রে নানা ফারাক রাখা হয়েছে। যেখানে ন্যূনতম বেতন ১০০ রুবল, কারখানা শ্রমিকদের গড় বেতন ১৮০ রুবল, সেখানে একজন দক্ষ শ্রমিক মাসে ৪০০ রুবলও রোজগার করতে পারেন।

তবে দেশব্যাপী এই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি আশঙ্কা থেকেই যায়। সেটি হল উৎপাদনশীলতার সমস্যা। আমাদের দেশের সরকারি চাকুরে বা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার শ্রমিকদের মত সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন ফাঁকিবাজ শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়াবে না। ধর্মঘট, ঘেরাও, কর্ম বিরতি, শ্লোগান, মাস-ক্যাজুয়াল লিভ, গো স্লো এই সব শব্দ এখানে অশ্রুত। কিন্তু শ্রম পরিচালনায়, উৎপাদন তত্ত্বাবধানে যে লক্ষ লক্ষ দক্ষ পরিচালক লাগে তত পরিচালক সর্ব ক্ষেত্রে মেলে না। এর ফলে বহু ক্ষেত্রে পরিচালনাগত নানা ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়ে। অনেক সময় দ্রুত কাজ হতে চায় না। অথচ এদেশের অর্থনীতি এমন, কোন একটি স্তরে গোলমাল হলেই সমস্ত সিস্টেমটি ভেঙে পড়তে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে যেটি বিস্ময় আমার কাছে, সেটি হল এর বণ্টন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে সামান্য রেশনিং ব্যবস্থা আমরা সাফল্যের সঙ্গে চালু রাখতে পারিনি। গ্রামাঞ্চলে কোনদিনই আমরা সুষ্ঠুভাবে রেশনিং সামগ্রী নিয়মিত পৌঁছে দিতে পারিনি। কিন্তু এই বিশাল দেশের একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশেও রুটি থেকে শুরু করে বাচ্চাদের খেলনা পর্যন্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এর সমস্ত স্তরেই কিন্তু সরকারি পরিচালনা। গম ফলান থেকে শুরু করে সেই গম থেকে রুটি তৈরি করা এবং সেই রুটি খুচরো দোকান থেকে বিক্রি করা এই একটি আইটেমই যদি ধরা যায় তাহলে ভেবে দেখতে গেলে সেটা এক বিরাট কাণ্ড। ২৬ কোটি মানুষের কাছে সারা দিনের রুটি প্রতিদিন সকালে পৌঁছে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, আবশ্যিক আইটেম হিসাবে তার মূল্যমানও ঠিক রাখতে হয়। রুটির কিলোগ্রাম ১২ কোপেক বছরের পর বছর ধরে ঠিক রয়েছে। আমাদের

দেশে সরকারি পরিচালনা মানে শ্রম ও অর্থের নিদারুণ অপচয়। সরকারি উদ্যোগ মানে জনগণের অর্থ লুঠ। সরকারি টাকা মানে গৌরী সেনের অর্থ—যেখানে কাজ করার দরকার হয় না। আমাদের অর্থনীতিকে যদি সবচেয়ে বেশি করে কেউ বিপর্যস্ত করে থাকে তাহলে করেছেন এক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। যেখানে মালিকের শোষণ সেখানে ধর্মঘট হয়তো শেষ অস্ত্র। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে শোষণের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে মালিক সরকার। অর্থ জনগণের। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প শ্রমিকদের তার সাধ্যমত বেতন ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও উৎপাদনের বেলা সেখানে অষ্টরম্ভা কেন? সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন তো উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের উৎসাহিত করে না, যতখানি তাদের উৎসাহ আরও পাণ্ডিয়ে দেবার ব্যাপারে।' আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মস্কো বেজিং তো ঘর বাড়ি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে সমাজতান্ত্রিক দেশের উৎপাদনের একটি মডেলও অন্তত তাঁরা তৈরি করে দেখিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের সেদিকে কোন উদ্যোগ বা উৎসাহ চোখে পড়েনি।

সোভিয়েতের কলকারখানাতেও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি হয়। সিবলিট মাস কারখানার কর্মীদের বছরে ছ শতাংশ করে বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে। ডিরেক্টর জানালেন, প্রতি বছর উৎপাদন যেমন বাড়ছে লভ্যাংশও তেমনি বাড়ছে। কাজেই অতিরিক্ত লভ্যাংশ কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে কোন অসুবিধে নেই। তবে উৎপাদন আরও বাড়ান যেত লোক পেলে। আমাদের কারখানায় এখনও পাঁচ শতাংশ লোকের দরকার।

জনসমস্যার উলটো দিকটা সোভিয়েত ইউনিয়নে এখনও প্রধান। অর্থাৎ শিল্প-কৃষি-পরিসেবার সম্প্রসারণ ঘটাতে গেলে আরও লোক চাই। একজন সখেদে বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েতের যে ছ কোটি মানুষ মারা গেছেন আমরা তার অভাব বোধ করছি। এই ছ-কোটির অধিকাংশই তরুণ। তাঁরা বেঁচে থাকলে আজ তাঁদের সন্তানেরা এই জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করত পারত।

বহুবিধ উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও আধুনিক সোভিয়েত তরুণেরা এক

ওঁর দোর বেশি সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী নন। সন্তানহীনকে এদেশে বেশি আয়কর দিতে হয় এবং সন্তানের সংখ্যা অনুসারে আয়কর দেবার ব্যাপারে সুবিধা মেলে। অবশ্য মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার খুবই বেশি। ছ'টি সাতটি করে সন্তান আছে এমন অনেক দম্পতিকে পাওয়া যায় সেখানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি বা বৃটেনের মত বহিরাগত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করালে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদন দ্বিগুণ হতে পারত। কিন্তু বাইরের শ্রমিক আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে সব সমস্যা সৃষ্টি হত তাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হত বেশি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এখনও হাইটেক উৎপাদন সর্বক্ষেত্রে এখানে পরিব্যাপ্ত হয়নি। পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে আগামী দিনগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হাইটেকের শরণাপন্ন হতেই হবে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক যোগানোর সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে বলে আমার ধারণা।

সাইবেরিয়া সায়েন্স আকাদামি

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্পকলা, সাহিত্য—জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বিকাশের প্রশস্ত পথ রচনা করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। আজ এদেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ। এই ১৩ লক্ষ বিজ্ঞানীই দেশের উন্নতির কাজে নিয়োজিত। রাষ্ট্র তাঁদের মঙ্গলের জন্য কোন আয়োজনের' ত্রুটি রাখেনি। হতাশ বৈজ্ঞানিকের দেশত্যাগ ভারতে অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিছুদিন আগে আমি আমেরিকার পিটসবুর্গ শহরে অধ্যয়নরত বিজ্ঞানের ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। তাঁদের অধিকাংশেরই ইচ্ছা পাস করার পর দেশে না ফেরার। এমন অবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে চিন্তা করা যায় না। বিজ্ঞানীরা সে দেশে বিশেষভাবে পূজিত। ওদেশে সর্বোচ্চ যাঁরা আয় করেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিজ্ঞানীরা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানীদের সংঘবদ্ধভাবে দেশের কাজে লাগাবার জন্য তৈরি হয়েছে 'আকাদামি অব সায়েন্স'। আমাদের দেশে

যা কিছু জাতীয় কর্মকাণ্ড তা শুধু দিল্লিতেই আবদ্ধ। সারা দেশকে শোষণ করে দিল্লি সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে তা হবার উপায় নেই। সেখানে জাতীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রসঙ্গত ধরা যাক সোভিয়েত আকাদামি অব সায়েন্সের কথা। আমি মস্কোতে জাতীয় সায়েন্স আকাদামি দেখিনি। কিন্তু সাইবেরিয়ার নভোসিবিরস্ক শহরে বিজ্ঞান আকাদামির শাখা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। শুধু নভোসিবিরস্ক শহরে নয়, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদামির শাখা আজ সাইবেরিয়ার ইরকুটস্ক, এয়াকুস্ক ও উলান উড শহরে বিস্তৃত। সাইবেরিয়ার টমস্ক ও ক্রাসনইয়ারস্ক শহরে নতুন বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরও ছটি শহরে বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রসারিত হওয়ার কথা।

নভোসিবিরস্ক শহর থেকে বিজ্ঞানীদের এই নতুন শহরের দূরত্ব ২০ কিলোমিটারের মত। মসৃণ চওড়া রাজপথ ধরে অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি চলল। এক জায়গায় দেখলাম ওব নদীতে ড্যাম তৈরি করে কৃত্রিম সমুদ্র তৈরি করা হয়েছে। এমনকী বালি এনে তৈরি করা হয়েছে সমুদ্র সৈকত। অন্তহীন জলরেখাকে সমুদ্র বলেই মনে হয়। এ জায়গাটায় গ্রীষ্মের সময় দলে দলে মানুষ আসেন। পাশেই রেল স্টেশন। শহর থেকে ২৫ মিনিটের মধ্যেই এখানে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে পারেন নভোসিবিরস্কের নাগরিকেরা। এই পথ দিয়ে আর দশ মিনিটের ড্রাইভ বিজ্ঞান নগরী। ঘন অরণ্যের মধ্যে তৈরি হয়েছে ১৭ বর্গকিলোমিটারের এক উপনগরী। যেখানে রয়েছে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদামির সাইবেরিয়া শাখা। এটাই সাইবেরিয়ার সায়েন্স ডিভিশনের মূল কেন্দ্র।

কেন্দ্রটি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ টাউনশিপ। ঘন অরণ্যের মধ্যে এর অবস্থান মধ্যে আছে ২৬টি ইনস্টিটিউট ও নটি ডিজাইন অফিস, স্টাফ কোয়ার্টার্স, স্টোর্স, সিনেমা হল এবং একটি বিশেষ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়। সাইবেরিয়ার মত অঞ্চলে এই বিরাট আকাদামি নগরী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ল কেন? এর উত্তর পেলাম আকাদামি অব সায়েন্সের

বিদেশ সম্পর্ক অফিসারের কাছে। তাঁর নাম ইগরি নেভলিন।

তিনি বললেন: ১৯২১ সালে এই আকাদামি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে ১ কোটি বর্গ মাইল সাইবেরিয়ার এলাকায় মাত্র আড়াই কোটি লোক বাস করে। সাইবেরিয়া গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধেক, কিন্তু লোক সংখ্যা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ। এই সাইবেরিয়াতে দেশের ৮৫ শতাংশ জ্বালানি মজুত আছে। সারা বিশ্বে যত কয়লা আছে তার ৫০ শতাংশ এই সাইবেরিয়ায়। যখন প্রশ্ন উঠল কীভাবে এই সম্পদ ব্যবহার করা যাবে তখন বোঝা গেল বিজ্ঞানের উন্নতি না ঘটালে তা সম্ভব হবে না। ১৯৫৭ সালের আগে সাইবেরিয়াতে মাত্র ১ জন অ্যাকাদেমিসিয়ান ও ১০ জন বিজ্ঞানী কাজ করতেন। এখন ৫০০ পি এইচ. ডি. ডিগ্রিধারী বৈজ্ঞানিক সাইবেরিয়াতে কাজ করছেন। সাইবেরিয়া বিজ্ঞান আকাদামি তৈরি হয়েছে বহুবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে। এর একটি হল বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা। এই গবেষণা-লব্ধ বিদ্যা উৎপাদনের কাজে লাগান।

তৃতীয়ত তরুণ বিজ্ঞানী তৈরি। এই তরুণ বিজ্ঞানী তৈরির ব্যাপারটি আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হল।

এই বিজ্ঞান উপনগরীতে এক বিশেষ স্কুল তৈরি করা হয়েছে এজন্য। সারা সাইবেরিয়ার স্কুল ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে ৩০০ ক্লাস এইটের ছেলেমেয়ে নির্বাচন করা হয়। এই ৩০০ ছেলেমেয়েকে পদার্থবিদ্যা ও গণিত পড়ান হয়। আকাদামির বিজ্ঞানীরাই তাদের পড়ান। পড়ান বলতে তাদের বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয় ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী হবার জন্য। এঁদের নির্বাচন পদ্ধতিও বেশ চিত্তাকর্ষক। সর্বপ্রথম সাইবেরিয়ার সমস্ত স্কুলে গণিতের কতগুলি প্রশ্ন পাঠান হয়। ওই প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দিতে পারে তাদের মধ্যে থেকে দশ হাজার ছেলেমেয়ে নির্বাচন করা হয়। ওই দশ হাজার ছাত্রছাত্রীদের একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষায় পাশ করে ৬০০-৭০০ ছেলেমেয়ে। ওই ৬০০-৭০০ ছেলেমেয়েকে এই উপনগরীতে নিয়ে এসে বিশেষ কোচিং দেওয়া হয়। তারপর হয় আবার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায়

ভিত্তিতে ৩০০ জনকে গ্রহণ করা হয়। এই ৩০০ ছাত্র ছাত্রীকে দুবছর বোর্ডিং-এ রেখে পড়ান হয়। তারপর তাদের নিয়ে নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সাইবেরিয়ার বিজ্ঞান আকাদামি থেকে প্রতি বছরই বিদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আদান-প্রদান হচ্ছে। এই উপনগরীতে প্রায় কোন না কোন কারণে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও বিজ্ঞানীরা চলে আসেন। এখানকার বিজ্ঞানীরাও যান বিদেশে। যেমন এখানকার বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর এক প্রদর্শনী নিয়ে বম্বে ও দিল্লি যাবেন। ভারতের সঙ্গে এঁদের এক চুক্তি হয়েছে, যার ফলে প্রতি বছর ২৫ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সাইবেরিয়ায় যান ও ২৫ জন সাইবেরিয়ান বৈজ্ঞানিক ভারতে আসেন।

'সাইবেরিয়া আকাদামি অফ সায়েন্স' বিজ্ঞান বলতে মানবতার সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত কোন বিশেষ জ্ঞানের কথা ভাবে না। যদিও এই আকাদামিতে পদার্থবিদ্যা ও গণিতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি, তবু এই বিজ্ঞান নগরীতে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাস ও দর্শনের গভীর সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা হয়নি। যেমন স্বীকার করা হয়েছে নৃতত্ত্ববিদ্যা ও ভাষা-তত্ত্বের ভূমিকার কথা। বিজ্ঞান নগরীতে তাই গড়ে তোলা হয়েছে সাইবেরিয়ার নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। যেখানে নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব হাত ধরাধরি করে অন্বেষণ করেছে সাইবেরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস। সংগ্রহশালায় ঢোকার মুখেই পাওয়া যায় এক অতিকায় ম্যামথের কঙ্কাল। শোনা গেল ম্যামথটি আবিষ্কৃত হয়েছিল গভীর বরফের স্তূপের নিচে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার দেহ অবিকৃত ছিল এবং তার মাংস কুকুরেরা খেয়েছে কয়েক লক্ষ বছর পরেও। দশ লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষ প্রথম সাইবেরিয়ায় এসেছিল শিকারের সন্ধানে। প্রাচীন মানুষের ব্যবহার্য যে জিনিস পাওয়া যায় তা তিন লক্ষ বছরেরও পুরনো। ২০ হাজার বছর আগে মানুষের তৈরি পুতুলের সন্ধান পাওয়া যায়। আংরা নদীর উপত্যকা ধরে বসতি স্থাপন হয়েছে। তখনকার সময়ের যেসব পুতুল পাওয়া গেছে তাদের গায়ে কারুকার্যখচিত জামা

কাপড়। অনেক মূর্তিকে দেবদেবীর মূর্তি বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। সাইবেরিয়া অর্থে ঘুমন্ত নগরী। কিন্তু তিন লক্ষ বছর আগেও সভ্যতার সুস্পষ্ট চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা।

সংগ্রহশালায় দেখা গেল সাইবেরিয়ায় নব্য প্রস্তর যুগের অনেক নিদর্শন রয়েছে। যেমন ধনুক, পাথরের তৈরি তাবিজ, জানোয়ারের দাঁত দিয়ে তৈরি মালা, আমুর নদীর তীরে বসতি স্থাপনকারীরা বড় বড় ভাসের ওপর তৈরি করেছিল অপূর্ব চিত্রকলা। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেও ওরা সলোমন গাছের ছাল দিয়ে পোশাক তৈরি করত।

সাইবেরিয়ার বিজ্ঞান আকাদামিতে শুধু বিজ্ঞান চর্চাই হয় না। পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, অর্থনীতি সমস্ত কিছু নিয়েই কাজ চলে। যার জন্য এই আকাদামির মধ্যে আছে ইনস্টিটিউট অব হিস্ট্রি, ফিললজি অ্যাণ্ড ফিলজফি। আছে ইনস্টিটিউট অব ইকনমিকস অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং।

আমাকে ইনস্টিটিউটের কর্তা জানালেন: অক্টোবর বিপ্লবের আগের সাইবেরিয়ার ইতিহাস নিয়ে গবেষণার জন্য একটি বড় বিভাগ রয়েছে। রুশ সাহিত্যের উন্নতি নিয়েও গবেষণা চলছে। গবেষণা চলছে সাইবেরিয়ার উপজাতিদের নিয়ে। ভাষাতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশ করেছে দু-খণ্ডে লেখা সাইবেরিয়ার সাহিত্যের ইতিহাস। সবচেয়ে মূল্যবান কাজ হল ৬০ খণ্ডে সাইবেরিয়ার লোক কাহিনী। পৃথিবীতে এত বড় কাজ কখনও হয়নি। ১০ খণ্ড পর্যন্ত ছাপা চলছে। এই লোককথাগুলি হবে দ্বিভাষিক। যে যে উপভাষায় লোককথা সেগুলি অবিকল উদ্ধৃত করা হবে। সঙ্গে থাকবে রুশ অনুবাদ। ইয়াকুদ, আলতাই, বুরইয়াৎ প্রভৃতি উপজাতির লোককথার সঙ্গে সঙ্গে, একটি করে ডিস্ক রেকর্ড দেওয়া হবে ক্রেতাকে। মূল লোককথা কী সুরে গাওয়া হত তার অবিকল সুর ও উচ্চারণ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যাবে ওই রেকর্ডের মাধ্যমে। এছাড়া তাঁরা প্রকাশ করেছেন দুখণ্ডে সাইবেরিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের ইতিহাস। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে সাইবেরিয়ার ইতিহাস। আরও নানা ধরনের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা আছে

তাঁদের মাথায়। যেমন ১৫ শতাব্দী থেকে সাইবেরিয়ায় বহিরাগতদের আগমন ও বসতি স্থাপনের ইতিহাস। শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস। এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের যাবতীয় তথ্যপঞ্জীর তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আর পাণ্ডুলিপি। সংগ্রহশালায় তাঁরা অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেছেন দেখালেন। আকাদামির সমাজতত্ত্ববিদ, কৃষিবিজ্ঞানী ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা মিলে সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বেরিয়ে পড়ছেন বিপ্লবের পর নতুন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে উপজাতিদের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য। সাইবেরিয়ানরা মনে করে সাইবেরিয়া আদি সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি। হাজার হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগে সাইবেরিয়া ও আমেরিকা একই ভূখণ্ডে যুক্ত ছিল। সাইবেরিয়া থেকেই মানুষ যায় জাপানে ও যুক্তরাষ্ট্রে। এ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা চলছে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তভাবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের এমন মেলবন্ধন এর আগে আমার কাছে অশ্রুত ছিল। আমরা ভারতে যে বিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি করছি তা ইতিহাস সাহিত্য দর্শনকে বাদ দিয়ে। অথচ বিজ্ঞান যে দেশের সামাজিক গতিপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নয় তা আমাদের দেশের কজন বিজ্ঞানী বোঝেন? সাইবেরিয়া বিজ্ঞান আকাদামিতে দার্শনিকেরা একই সঙ্গে বসে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে উদ্ভূত সাধারণ সমস্যাগুলির মীমাংসা করছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তার পূর্ব পশ্চিম সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে। বিজ্ঞানে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে চলছে বৈজ্ঞানিক সহায়তা। ভাব ও ভাবনার আদান-প্রদান। সাইবেরিয়ান আকাদামিতে বিদেশি বৈজ্ঞানিকের আগমন লেগেই আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মত ও পথের আকাশ-পাতাল ফারাক থাকলেও পশ্চিমী সংস্কৃতি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চলে এসেছে রুশ জীবনে। আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের অনুবাদ হচ্ছে রুশ ভাষায়। বিক্রি হচ্ছে জাজ ও রকের রেকর্ড। হোটেলেও চলছে রক নৃত্য। আধুনিক তরুণরা জিনসের ভক্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সমস্ত

কিছু গ্রহণ করেও রুশীরা সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রচ্ছন্ন একটি জাতীয়তাবোধ সমস্ত রুশীকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সে জাতীয়তাবোধ হল, আমরা রুশীরা বহু জীবনের বিনিময়ে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছি। পৃথিবীতে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই সমাজবাদের পূর্ণ ও পরিণত রূপ দেখা যাবে। এই সমাজতন্ত্রই আমাদের প্রাণবায়ু।

বিজ্ঞান আকাদামির মত শহরের আর এক প্রান্তে গড়ে উঠেছে কৃষি আকাদামি। বিজ্ঞান আকাদামিতে যেমন অরণ্যের শোভা কৃষি আকাদামিতে অরণ্য নেই, আছে সবুজ প্রান্তর। এর চারপাশের সমস্ত সবুজ মাঠই কৃষি আকাদামির ল্যাবরেটোরি। এখানেও ঘুরে ঘুরে দেখলাম মিউজিয়ম, ডিজাইন সেণ্টার সহ সাতটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ইনস্টিটিউটগুলি ঢাকা করিডর দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। যাতে ঠাণ্ডার দিনে একবাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যেতে গেলে রাস্তায় না বেরুতে হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

ইনস্টিটিউটে দুটি বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহ আছে। সামনে দেখা যায় গোটা স্বর্ণ বলয়ের মত টাউনশিপ। বার হাজার লোক বাস করে ওখানে। বিজ্ঞান আকাদামির মত কৃষি-আকাদামিও স্বয়ং-সম্পূর্ণ টাউন-শিপ। এখানে চারটি কিণ্ডারগার্টেন, দুটি সেকেণ্ডারি স্কুল, দুটি সুইমিং পুল, হাসপাতাল, ট্রেড সেণ্টার সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। কৃষি আকাদামির গ্রন্থাগারে কৃষি বিষয়ক বই-এর সংখ্যা দশ লক্ষ। এই আকাদামির অধীনে আছে ২৪টি পরীক্ষা স্টেশন ও ৬২টি পাইলট ফার্ম। সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও যাতে ফসল ফলাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গবেষণা চলছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পাবলিক বিল্ডিংগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দামী মার্বেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কৃষি আকাদামির বাড়িগুলিতে মার্বেল, মোজায়েক ও মুর‍্যালের কাজ দেখে বিস্ময় জাগে। যেখানে জনগণের জন্য কিছু করা হচ্ছে সেখানে বিলাস-ব্যসনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে ওদের দ্বিধা নেই।

আমি শুনলাম এই বিশাল টাউনশিপ তৈরির ব্যয় বহন করেছে দেশের জনগণ। একে বলে সাববোটিস্ক। পার্টি থেকে দেশের সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানান হয় আপনারা দেশের একটা ভাল কাজের জন্য এক দিনের বেতন দিন। দেশবাসী সঙ্গে সঙ্গে সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক শনিবারে ছুটির দিন অতিরিক্ত কাজ করলেন। সেদিনের কাজের সমস্ত টাকা তাঁরা দিয়ে দিলেন এই কৃষি আকাদামি প্রতিষ্ঠার জন্য। মোট ১২ কোটি রুবল উঠেছিল সেবার।

দেশের উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে ছেলেমেয়েরা যেমন গর্ব অনুভব করে তেমনি গর্ব অনুভব করে দেশের গৌরবের সঙ্গে একাত্ম হতে।

নভোসিবিরস্ক শহরে যুদ্ধ স্মারকের সঙ্গে একালের তরুণ মনকে একাত্ম করার এক অভিনব প্রয়াস চোখে পড়ল। ওয়ার মেমোরিয়াল বা যুদ্ধস্মৃতি ইওরোপের প্রায় সব দেশেই আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায় প্রতিটি শহরেই আছে এই যুদ্ধস্মৃতি। কারণ দু'কোটি সোভিয়েত নাগরিক প্রাণ দিয়েছিলেন গত যুদ্ধে। কিন্তু নভোসিবিরস্ক এই যুদ্ধ-স্মৃতিকে কেন্দ্র করে যে অভিনব পরিকল্পনা করেছে তা গ্রহণ করেছে আরও অনেক শহর। সান বাঁধানো বিরাট এক চত্বর। তার সামনে লম্বালম্বিভাবে দাঁড় করান কয়েকটি সমাধি ফলক। এই ফলকে ৩১ হাজার নিহত সৈনিকের নাম লেখা। নভোসিবিরস্ক শহর থেকে ৩৫ হাজার সৈনিক যোগ দিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন মাত্র তিন হাজার। সেই বত্রিশ হাজার সৈনিকের স্মৃতিতে জ্বলছে অনির্বাণ এক মশাল শিখা। আর এই মশাল শিখা পাহারা দেয় নভোসিবিরস্কের দুশো স্কুলের নির্বাচিত ছাত্ররা। প্রতি সপ্তাহে পালা পড়ে এক একটি স্কুলের। স্কুল থেকে নেওয়া হয় জন ত্রিশেক ছাত্রের একটি দলকে। শুধু সেরা ছাত্র ছাত্রীদেরই বাছাই করা হয়। কারণ ওয়ার মেমোরিয়ালে গার্ড হওয়াকে ছাত্ররা মনে করে এক দুর্লভ সম্মান। নির্ধারিত সপ্তাহে সকাল আটটা থেকে ওই দলটি পালা করে গার্ড দেয় সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত। তাদের দেওয়া হয় গার্ডের পোশাক। এক সঙ্গে চার থেকে ছ' জনের ডিউটি থাকে। বাকীরা অপেক্ষা করে মেমোরিয়ালের হল ঘরে।

সেখানে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এমন প্রাক্তন সৈনিকেরা এসে একালের ছেলেমেয়েদের শোনান তাঁদের অভিজ্ঞতার কাহিনী। এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে জাতির গৌরবগাথা।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম আমাদের ইতিহাসেও ছিল এক সুদীর্ঘ গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। কিন্তু কত দ্রুত এই প্রজন্মের সামনে গড়ে উঠল অতীতের সঙ্গে ব্যবধান। যাঁদের রক্তে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে জাতি তাঁদের স্মরণে রাখল না। শুধু স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের কয়েকটি শর্ট নোটে পরিণত হয়ে রইল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

লেখকদের সঙ্গে স্মরণীয় বিকেল

আমি ভারতীয় লেখক বলে নভোসিবিরস্ক রাইটার্স ইউনিয়নের সদস্যরা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ল্যাংকিন বলেছিলেন: আপনার যদি ইচ্ছা না হয় তাহলে এই প্রোগ্রাম বাতিল করতে পারেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে নিশ্চয়ই ক্লান্ত।

আমি বলেছিলাম, ক্লান্ত ঠিকই, তবে লেখক ও সাংবাদিকরা আমার স্বজাতি। তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে গেলে মন খুঁত-খুঁত করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও আগ্রহ বিস্ময়কর। যা কিছুই ছাপা হয় হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ধরনটাও আমাদের দেশ থেকে ভিন্ন। ওদেশে সমস্ত পেশা ও বৃত্তির লোকেরাই ট্রেড ইউনিয়ন-বদ্ধ। সেই পেশাটি মোটামুটি এই ইউনিয়নেরই নিয়ন্ত্রণে। আর ইউনিয়ন সেদেশে এক একটি ইনস্টিটিউশন। তাঁদের নিজস্ব অফিস, কর্মী, ফাণ্ডে মোটা টাকা।

শিল্পীদের জন্য ইউনিয়ন, লেখকদের জন্য ইউনিয়ন, প্রকাশকদের জন্য ইউনিয়ন। এক একটি ইউনিয়ন জাতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত। আর ইউনিয়ন মানে একটাই ইউনিয়ন—একই বিষয়ের উপরে একাধিক ইউনিয়ন থাকবে তার কোন উপায় নেই।

অন্যান্য রিপাবলিকে রাইটার্স ইউনিয়নের নিজস্ব বাড়ি আছে। তবে নভোসিবিরস্কের লেখকেরা এখনও বাড়ি করে উঠতে পারেননি। তবে তাঁদের টাকা বরাদ্দ করা আছে এজন্য। মোট ৪২ জনের মত সদস্য এই ইউনিয়নের। শহরের সাহিত্য ঐতিহ্য অনেক দিনের। ভ্লাদিমির যাজুব্রিন, যিনি ১৯২০ সালে 'দুই সংসার' উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি এই শহরের লোক। ভ্লাদিমির ছিলেন লেনিনের বন্ধু। মহিলা ঔপন্যাসিক লেডিয়া সেফুলিনা এই শহরের। 'দুঃখিত নদী' উপন্যাসের লেখক ভি শিসকভ এই শহরের মানুষ। শহরের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড একটি পার্কের ভেতর আমরা রাইটার্স ইউনিয়নের অফিসে এলাম। এই শহরে পার্ক মানে অরণ্য। সেই অরণ্যের মধ্যে বাবা মা ছেলেমেয়েরা নাগরদোলায় চড়ে মহানন্দে দোল খাচ্ছে। আর একটু এগোতেই পড়ল খোলা বাজার। সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন ফ্ল্যাট ছাড়াও গ্রামে একটি ছোট খামার বাড়ির মালিক হওয়া যায়। ওই বাড়ির সংলগ্ন জমিতে যে ফসল ফলাবেন সেটি বিক্রি করা যায় এই খোলা বাজারে। তাছাড়া যৌথ খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষকেরা ব্যক্তিগত বাগিচা করার জন্য কিছু জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখতে পারেন। সেই জমির উদ্বৃত্ত ফসলও বিক্রি করা যায়, কেউ কেউ গাছের ফুল নিয়ে বসে যান ফুটপাথে।

খোলা বাজারের ঠিক বিপরীতে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের নিচের তলায় রাইটার্স ইউনিয়নের অফিস। লেখকেরা আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দরজার সামনে স্বাগত জানালেন ভিতালী জিলিনস্কি, লেখক সংঘের চেয়ারম্যান। তিনি আমাকে একে একে আলাপ করিয়ে দিলেন অনুবাদক তিতাইনিকের সঙ্গে। গদ্য লেখক ভ্যাসিলি কালিকোভের সঙ্গে। প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য পত্রিকার বিভাগীয় প্রধান ভাদিমির শাপসনিকভ, প্রাবন্ধিক ইউনি মসতোকভের সঙ্গে আলাপ হল।

প্রত্যেক শহরে যেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যায় লেখকেরা আছেন সেখানে রাইটার্স ইউনিয়ন তৈরি হতে পারে। তবে সদস্য হলে লেখককে

অন্তত দুটি বই প্রকাশ করতে হবে।

জিলিনিসকি বললেন: আমাদের বড় উদ্দেশ্য হল সব লেখক মিলে একটা আড্ডার পরিবেশ তৈরি করা। তরুণ লেখকদের প্রতি আমরা বিশেষ উৎসাহ নিয়ে থাকি। যে কোন তরুণ লেখক তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। আমরা তাদের পাণ্ডুলিপি পড়ে বলে দিই কেমন হয়েছে। কোথায় সংশোধন করতে হবে। তরুণ লেখকদের লেখা শেখাবার জন্য আমরা একটা কর্মশালা করি। অবশ্য আমাদের সদস্য হতে গেলে আমাদের কাছে যে তালিম নিতে হবে তা নয়। সদস্য আমরা তখনই করব যখন কারও বই বাজারে বেরুবে। তার লেখা নিয়মিত বেরুতে থাকবে। লেখক সংঘের আর একটা কাজ সদস্যদের নানা সাহায্য করা। তার ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দেওয়া। চিকিৎসায় অর্থ সাহায্য করা। এছাড়া লেখক সংঘের কতগুলি প্রকাশনা আছে। যেমন তাঁরা একটি ভাল সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন সাইবেরিয়ান নাইট। ১৯২২ সাল থেকে চলছে পত্রিকাটি। বিক্রি হয় এক লক্ষ কপি। সাইবেরিয়ার বাইরেও বিক্রি হয়। লেখকরাও এদেশে পেনশন পেতে পারেন, সেটা রাইটার্স ইউনিয়নই দেয়। মাসে ১২০ রুবল করে।

জিজ্ঞাসা করলাম: নভোসিবিরস্কের লেখকরা বই ছাপার জন্য কোথায় যান? জিলিনিসকি বললেন: এই শহরে একটি প্রকাশনা সংস্থা আছে, তাঁরা বছরে খন ৪০-এর মত বই ছাপেন। লেখক একটু খ্যাত হলে মস্কোতে রাইটার্স ফেডারেশন মারফৎ বড় প্রকাশকদের কাছে যেতে পারেন। নাম করতে পারলে লেখকদের টাকার অভাব নেই। এক ফর্মার জন্য নূ্যনতম ১৫০ রুবল রয়্যালটি গদ্য হলে ১৫ হাজার কপি প্রথম ছাপা হয়, তার ওপর ফর্মা—প্রতি ১৫০ রুবল করে রয়্যালটি। তবে নামী লেখক ৩০০-৪০০ রুবলও পেতে পারেন। পরের সংস্করণে পাওয়া যায় ৬০ শতাংশ। তৃতীয় সংস্করণেও ৬০ শতাংশ, চতুর্থ সংস্করণে ৪০ শতাংশ। কবিতার রয়্যালটি হয় লাইন হিসাবে। ন্যূনতম ছাপা হয় পাঁচহাজার। নিবন্ধের বই-এর

রয়্যালটি বেশি। ফর্মা প্রতি ৩০০ থেকে ৩৫৫ রুবল।

তবে উপন্যাসের বিক্রিই সবচেয়ে বেশি। আধুনিক সাইবেরিয়ান সাহিত্যে কী লেখা হচ্ছে ?

জিলিনিসকি বললেন : ঐতিহাসিক লেখা হচ্ছে। সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত শাসনের প্রতিক্রিয়া, আদিবাসীদের জীবন নিয়ে লেখা হচ্ছে, লেনিনকে নিয়ে এখনও উপন্যাস বেরুচ্ছে, আবার মানুষের সমস্যা নিয়ে লেখা হচ্ছে যেমন পল্যুশান।

: আপনারা কি লেখকদের বিষয় ঠিক করে দেন ?

: না। গল্প উপন্যাস অর্ডার দিয়ে হয় না। এ নিয়ে ডকুমেণ্টারি গদ্য হতে পারে। লেখকেরা নিজেরা ঠিক করেন কী লিখবেন। অনেক সময় আমাদের নেতারা এমন আশা করেন। একবার এক নেতা বললেন আমাদের খাদ্য সমস্যা নিয়ে কিছু লিখতে বলুন লেখকদের। আমি বললাম, এ নিয়ে গল্প উপন্যাস কী করে হবে, ডকুমেণ্টারি গদ্য হতে পারে। তবে ডকুমেণ্টারি গদ্য লেখার মাল মশলা সংগ্রহ করতে করতে লেখক গল্প উপন্যাসের মাল মশলা পেয়ে যেতে পারেন। অনেক সময় লেখার মাল মশলা সংগ্রহের জন্য লেখক যদি বাইরে যেতে চান আমাদের বললে তাঁর গাড়ি ভাড়া থাকা খাওয়া ফ্রি করে দিই।

আমার প্রশ্ন : আপনারা সাহিত্যকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেন ? কতখানি মারকসবাদী-লেনিনবাদী হল, না কতখানি রসোত্তীর্ণ হল ?

: দেখুন, মিখাইল সলোকভ বলেছেন আমরা সোভিয়েত লেখকেরা লিখে থাকি জনগণ ও আমাদের পার্টির প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য। লেখকরা জনগণের হৃদয় ও পার্টির হৃদয়।

: আপনারা লেখায় প্রশাসনের সমালোচনা করতে পারেন ?

: নিশ্চয়ই। আমাদের ব্যঙ্গ সাহিত্য যথেষ্ট শক্তিশালী। সমালোচনা না করতে পারলে এটা কি হত ? তবে আমরা চাই প্রতিবাদ করার ফলে যে সব ঘাটতি আছে সেগুলো যেন চলে যায়। তাছাড়া আমাদের

অনেক লেখক আছেন যাঁরা শুধু গোয়েন্দা কাহিনী লেখেন। এই তো মিখাইল মিখায়েভ বলে আমাদের একজন সদস্য এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিরাট চুরি নিয়ে উপন্যাস লিখলেন। রাসপুটিন জনগণের সমস্যা নিয়ে লিখছেন। তবে নিছক প্রেম নিয়েও সাহিত্য রচনা হচ্ছে। এসব লেখা মেয়েরাই বেশি লিখছেন। তবে প্রেম তো সব লেখকের লেখাতেই কিছু না কিছু থাকেই।

আমি যেহেতু ছোটদের জন্যও লিখে থাকি সেহেতু ছোটদের লেখার কথাও এসে পড়ল। গল্প লেখক কালিকোভ বললেন : বাচ্চাদের বই-এর এদেশে দারুণ চাহিদা। গড়ে এক একটি বই ১৫ লক্ষ কপি করে বিক্রি হয়। কিন্তু তবু শুধু বাচ্চাদের জন্য কম লেখকই লিখে থাকেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক এখন সেরগে মিখানকভ। তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

: রাইটার্স ইউনিয়নের আয় কেমন ?

: প্রকাশকরা তাঁদের লভ্যাংশের দশ শতাংশ লেখক ইউনিয়নকে দেন। তাছাড়া ইউনিয়নের নিজস্ব পত্রিকা আছে। সদস্য চাঁদা থেকেও একটা আয় হয়। আমাদের ইউনিয়নের নিজস্ব স্টাফ ১০ জন। এদের বেতন দিতে অনেক টাকা চলে যায়। তাছাড়া প্রতিশ্রুতিবান তরুণ লেখকদের আমরা অর্থ সাহায্য করি। কীভাবে করি সেটাই বলছি। ধরুন কোন তরুণ লেখক পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেল, রিভিয়্যু করতে হবে। আমরা কোন লেখককে দিলাম পড়ে ছাপবার মত কিনা তা বলে দিতে। তিনি তো বিনা পয়সায় করবেন না। তাঁকে টাকা দিতে হয়। ইউনিয়ন সেটা দেয়। লেখক অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিলে যাবতীয় খরচ আমরা দিই। সবচেয়ে বড় খরচ ক্রিয়েটিভ সেণ্টারের পিছনে। আমাদের নেই, অন্য শহরের লেখক ইউনিয়নের এটা আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরিবিলি কোন বাড়িতে লেখককে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেখানে তিনি মন দিয়ে লিখতে পারবেন।

: আপনার মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী ?

: সর্বত্র যা উদ্দেশ্য আমাদেরও তাই। জীবনের সত্য কী সাহিত্যে

তারই অন্বেষণ চলছে।

জিলিনিসকি কথাটা বলে প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্য সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্রকে বুঝতে গেলে পশ্চিমের চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে না। মনে রাখতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সমাজ ব্যবস্থা চালু করছে তা পশ্চিমী পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশের সমাজ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদেশে সব কিছুই এই সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় অশ্লীলতা, যৌনতা ও হিংসাত্মক উত্তেজনার স্থান নেই। ল্যাংকিন আমাকে বললেন: আমাদের চলচ্চিত্রে বিনোদন কিন্তু মুখ্য নয়, সমস্যার সমাধানই মুখ্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার বা তার বিরোধিতা করার অধিকার কারও নেই। আজ হয়ত কারও প্রয়োজনও নেই। বিপ্লবের পর সেখানে তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা আজ তরুণ হয়েছে। তারা এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই বড় হয়েছে। এই সিসটেম তাদের কোন স্বার্থে আঘাত করেনি বরং তারা এর সুফলটাই পেয়ে এসেছে। মানুষ কোন একটা সিসটেমে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেটাই তার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয়। ১৯১৭ সাল থেকে ত্রিশ সাল পর্যন্তও ওদেশে বহু লোকে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে। কারণ বহু লোকের কাছে এই সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের চেয়ে জারের আমলের অবাধ স্বাধীনতা সুবিধাজনক ছিল। পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদলে আমরা অভ্যস্ত। আমাদের কাছে তাই আধুনিক রুশ সাহিত্যকে বড় বেশি কমিটেড বলে মনে হতে পারে। সংবাদপত্রকে মনে হতে পারে সরকারি বুলেটিন। সাহিত্য তো ব্যক্তির ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করে। সেখানে অনেক বর্ণময় অবকাশ আছে মনোরঞ্জনের। হিউম্যান ইণ্টারেস্টের ব্যাপার আছে। কিন্তু ওদেশে সংবাদপত্র চালায় হয় সরকার, না হয় পার্টি। সরকার মানেই পার্টি। কাজেই সামাজিক লক্ষ্য আলাদা হতে পারে না। সমাজ বলছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে চালু রাখতে গেলে আগে উৎপাদনকে ঠিক রাখতে হবে। সেই সঙ্গে

জীবনের উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। জীবনের উৎকর্ষ বাড়াতে হলে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হয় মানুষ। পার্টির নির্দেশ যেন সে ঠিকঠিক মেনে চলে কারণ মানুষের যাতে মঙ্গল হয় পার্টি সে কথাই বলবে। কাজেই সেদেশে সংবাদপত্র খুললে প্রথম পাতায় উৎপাদন বৃদ্ধির কথা থাকে। থাকে উৎপাদনের সমস্যার কথা। আমরা যেসব আন্তর্জাতিক খবরকে ফলাও করে ছাপি সেগুলি সোভিয়েত কাগজের ভেতরের পাতার এক কলমের খবর।

কিন্তু সোভিয়েতের জনগণ খবরের কাগজের এই চরিত্র দেখতেই অভ্যস্ত। ডিসপ্লের আধিক্য নেই, ছবির বাহার নেই, কনজিউমার্স বিজ্ঞাপনে ঠাসা ঢাউস খবরের কাগজ দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়, যার পাতায় পাতায় উত্তেজনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ সেই ধরনের খবরের কাগজ পড়ে, যা আমরা হয়ত উলটেও দেখব না কারণ আমাদের মতে এতে খবর নেই।

কিন্তু এই খবরের কাগজ সোভিয়েত জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করে। আর পূরণ করে বলেই অবিশ্বাস্য রকমের কাগজ বিক্রি হয় সেখানে। সকাল সন্ধ্যায় কিয়স্কের সামনে এসে দাঁড়ালে শুধু দেখা যাবে একের পর এক মানুষ এসে একাধিক কাগজ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় স্তরে দৈনিক কাগজ আছে যা একযোগে ছাপা হয় বহু শহরে, আছে আঞ্চলিক প্রভাতী দৈনিক, সান্ধ্য দৈনিক, তরুণদের জন্য আলাদা দৈনিক বেরোয়। খেলার জন্য দৈনিক বেরোয়। সাপ্তাহিক তো অজস্র।

আমি নভোসিবিরস্কে থাকতে থাকতে সেখানকার প্রধান দৈনিক সোভিয়েত সাইবেরিয়া কাগজের পক্ষ থেকে আমার এক সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। শুনলাম আমার ওই শহরে আগমন সংবাদ স্থানীয় টি. ভি-তেও প্রচার করা হয়েছে। খবর সংগ্রহ করতে এসে নিজে খবর হয়ে যাওয়ায় বেশ আনন্দ হল। স্বদেশে প্রচার কপালে নেই। বিদেশে তবু ছাপার অক্ষরে নাম বেরুল। আরও শুনলাম সম্পাদক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। প্রোগ্রামটি সরকার-পক্ষ থেকেই

করা হয়েছিল। তাই আমি সোভিয়েত সাইবেরিয়ার বিরাট অফিসে গিয়ে সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে এক ঘণ্টার মত অতিবাহিত করলাম।

সোভিয়েত সাইবেরিয়া আঞ্চলিক পার্টি কমিটির মুখপত্র। প্রচার-সংখ্যা আড়াই লক্ষ। ৬১ জন কাজ করেন ওই কাগজে। ৩৫ জন সাংবাদিক। ১৯১৭ সালের ১ অক্টোবরের বিপ্লবের পরে পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় পত্রিকাটি। ওঁদের সান্ধ্য দৈনিক আছে আর আছে সাইবেরিয়ার তরুণ বলে আর একটি দৈনিক। ওঁদের ছাপাখানা থেকে ৪০টি কারখানার পত্রপত্রিকা ছেপে বেরোয়, বেরোয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাগজ। কিছু সাহিত্য পত্রিকাও ছাপা হয় তাঁদের প্রেস থেকে। সব মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ পত্রপত্রিকা ছাপা হয় তাঁদের ছাপাখানায়। এছাড়া আর একটি অবিশ্বাস্য রকমের কাণ্ড হয় সেখানে। মস্কো থেকে প্রকাশিত প্রাভদা ইজভেস্তিয়া সহ ১৪টি পত্রিকা প্রতিদিন রেডিও মারফৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওঁদের কাছে। ওঁরা ছেপে প্রচারের দায়িত্ব নেন। ওঁদের প্রেস থেকে প্রাভদার সাইবেরীয় সংস্করণ ছাপা হয় ৯০ হাজার, ইজভেস্তিয়া ৫৮ হাজার, সোভিয়েত রাশিয়া ৬০ হাজার। সারা বছর ওঁদের প্রেস থেকে সব মিলিয়ে ২ কোটি কাগজ ছাপা হয়। সোভিয়েত সংবাদপত্রে প্রশাসনের সমালোচনা থাকে এবং থাকে বলেই সাংবাদিকদের প্রশাসন বেশ সমীহ করে চলে। সোভিয়েত সাইবেরিয়াতে প্রতিদিন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় না। সপ্তাহে মাত্র একদিন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক জানালেন: আমরা এখন কোন স্পেশালিস্টদের দিয়ে সম্পাদকীয় লেখাচ্ছি। তিনি হয়ত নিজে লিখতে পারেন না। তখন আমরা লেখক পাঠিয়ে সাহায্য করি। এই সম্পাদকীয় ওই বিশেষজ্ঞের নামেই প্রকাশিত হয়।

সমস্যা? হ্যাঁ সমস্যা নিয়েই তো নিত্য আমাদের কাগজ লিখছে। নদীতে কারখানার দূষিত জল পড়ে জল দূষণ হচ্ছে, আমরা লিখছি, মদ্য পানের বিরুদ্ধে লিখছি, সাইবেরিয়ার সবচেয়ে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে দেরি হচ্ছে কেন সেটি নিয়েও লেখা হচ্ছে। আমরা লিখছি

যাতে আরও বেশি করে বাড়ি হয়। বাড়ির গুণগত মান খারাপ হচ্ছে বলে সমালোচনা করছি। অনেক সময় জনমত কোন কিছুর পক্ষে দাবি জানালে আমরা সরাসরি কর্তৃপক্ষকে গিয়ে বলি, দেখুন প্রচুর চিঠি আসছে, জনমত বিপক্ষে। অনেক সময় এটা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যায়।

ভারত সম্পর্কে গভীর মমতা তাঁর। বললেন: ইন্দিরার মৃত্যুর পর সাইবেরিয়ার মানুষ এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে কেউ কেউ চিঠিতে ইন্দিরাকে নিয়ে শোক কবিতা পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। এখানে ভারতীয় ছায়াছাবি খুবই প্রিয়। আমার নাতনি তো ডিস্কো ড্যানসার ছবির গান করে, এই তো কদিন আগে টিভিতে দেখলাম পরদেশী

ভারত-প্রেমিক রুরিখ

ভারতের সঙ্গে নভোসিবিরস্ক শহরের এক গভীর আত্মিকযোগের সেতুবন্ধ নভোসিবিরস্ক আর্ট গ্যালারিতে নিকোলয় রুরিখের কতগুলি মূল্যবান চিত্রকলার সংগ্রহ। এই ছবিগুলি রুরিখ এঁকেছিলেন ভারতে বসে। ভারত ছিল রুরিখের আশৈশব চেতনার মধ্যে। জন্মেছিলেন ১৮৭৪ সালে লেনিনগ্রাদের কাছে ইশবারা গ্রামে। ইশবারা শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত ঈশ্বর শব্দ থেকে এসেছে। গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করত ওই গ্রামে বহু প্রাচীন কালে একজন ভারতীয় থাকতেন। তাঁর নামে ওই গ্রামের নাম। পিটসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় লোকগাথা ও আর্ট কলেজ থেকে শিল্পকলায় ডিগ্রি নিয়ে রুরিখ ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যান। ১৯২৩ সালে নিজের ছবি নিয়ে বক্তৃতা দিতে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

রুরিখ বিশ্বাস করতেন রুশ সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা একই স্রোত-ধারায় ভেসে চলেছে। ছাত্র অবস্থায় ভারতীয় দর্শন পড়েন গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে। ১৯২৪ সালে ভারতে চলে আসেন দুই ছেলে ও পত্নীকে নিয়ে। এই সাইবেরিয়া দিয়ে মঙ্গোলিয়া পার হয়ে হিমালয়ের ভেতর দিয়ে এসে পৌঁছেছিলেন ভারতে। ১৯২৬ সালে কুলুতে আর্ট ইনস্টিটিউট তৈরি করেছিলেন। ১৯২৬ সালে আবার রাশিয়া ফিরে আসেন। ১৯৩৩-৩৪ তিব্বত ও চীন ঘোরার সময় হিমালয়ের

ওপর বহু ছবি এঁকেছিলেন তিনি।

১৯৪৫ থেকে ৪৭ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রুরিখের আঁকা ছবি-গুলির মধ্যে ৬০ খানি নভোসিবিরস্ক শহরের এই গ্যালরিতে রয়েছে। ১৯৪৭ সালে কুলুতে মারা যান রুরিখ। তাঁর বড় ছেলে শ্বেতোস্লভও একজন চিত্রকর। বিবাহ করেছেন দেবিকারানীকে। রুরিখের ছবির বৈশিষ্ট্য তাঁর রং। রুরিখ যেন রং নিয়ে খেলা করেছেন। তাঁর হিমালয় কখনও শুভ্র, কখনও লাল, কখনও ধূসর, কখনও বা গৈরিক। আকাশের রংও কখনও হলুদ, কখনও বা ঘন নীল। তাঁর বিখ্যাত ছবি বেদ সন্ন্যাসী নভোসিবিরস্ক গ্যালারিতে রয়েছে। প্রাচীন উপকথার অন্ধ সন্ন্যাসী জলাশয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছেন। প্রতিধ্বনি হচ্ছে চারিদিকে। বেদ সন্ন্যাসীর মনে হয়েছে তাঁর সামনে বহু মানুষের ভিড়। তিনি তাঁদের উপদেশ দিচ্ছেন। নির্জন পর্বতের সানুদেশে দাঁড়িয়ে এক মিস্টিক কল্পনা ছবিতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তেমনি আবার আর এক সন্ন্যাসীর ছবি—যায় ক্যাপসন সান্ত্বনা। সংসারের কোলাহল থেকে দূরে ধ্যানমৌন হিমালয়ের কোলে বসে ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী। এটাই তাঁর জীবনের পরম সান্ত্বনা।

আর একটি জীবন্ত ছবি নাস্তাসিয়া মিকুলিশনা—রুশ লোককথার নায়িকা। কিন্তু তার জামা কাপড় প্রাচ্যের মত। ঘোড়ায় চড়ে চলেছে নাস্তাসিয়া। মাথায় দুই বিনুনি দুলছে। পিছনে চড়া হলুদ রং। পাহাড়ের রং বেগুনি। কৃষ্ণনের বলে আর একটি ছবি। রুশ উপকথার রাখাল বালকের ছবি। যার সঙ্গে রাখাল বালক কৃষ্ণের মিল আছে।

রুরিখ রুশ উপকথার মধ্যে অন্বেষণ করেছেন ভারতকে। শেষ পর্যন্ত ভারতে গিয়েই তিনি পেয়েছিলেন সান্ত্বনা। নভোসিবিরস্ক সেই ভারত-প্রেমিক শিল্পীর জীবন চেতনাকে ধরে রেখেছে পরম সম্পদের মত।

ইয়াকুতিয়াতে পৌঁছন সম্ভব হল নভোসিবিরস্কের নভোস্তি প্রেস

এজেন্সির প্রতিনিধির কল্যাণে। ল্যাংকিনকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নভোসিবিরস্ক ভিসা অফিস আছে যেখানে। বিশেষ আবেদন করলে একটা ব্যবস্থা হয়ত হয়ে যেতে পারে। তবে প্রমাণ দেখাতে হবে ইরকুটস্ক নয় ইয়াকুতস্কে আমার জন্য প্রোগ্রাম ছিল। প্রমাণ তো ইয়াকুতিয়াতে আমার প্রোগ্রাম যেটি ল্যাংকিনের পকেটে।

নভোসিবিরস্ক থেকে যখন মধ্যরাতে ইয়ারকুটস্কের প্লেনে চেপে বসলাম তখন মনটা খুঁত খুঁত করছিল। ইরকুটস্কে গেলে লেক বৈকালের শোভা দেখা যেত। সাইবেরিয়া দেখতে যে সব পর্যটকেরা আসেন তাঁদের পথ হচ্ছে নভোসিবিরস্ক হয়ে স্যুসেনেস্কোজে। যে গ্রামে লেনিনকে রাখা হয়েছিল নির্বাসনে, যা আজ রুশদের কাছে তীর্থক্ষেত্র। এই গ্রামের কাছেই ইয়েনেসি নদীতে তৈরি হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সায়ানো স্যুসেনস্কোজে—যার উৎপাদন ৬৪০০ মেগাওয়াট।

স্যুসেনস্কোজে হয়ে ইরকুটস্ক দক্ষিণ সাইবেরিয়ার এই অঞ্চল হল ম্যাঙ্গোলিয়া ও চীনে যাবার সিংহদ্বার। ভারতের সিংহদ্বার যেমন খাইবার পাস। ইরকুটস্ক থেকেই একদা রুশরা নাকি যাত্রা করেছিল আলাস্কা ও কালিফোর্নিয়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা রুশদেরই এক শাখা এমন এক তত্ত্ব শুধু প্রচলিত নেই, তা নিয়ে চলছে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা। প্রাচীনকালে দুর্গমকে জয় করে মানুষের অভিযান দিক থেকে দিগন্তে। আজ যখন কলকাতার মানুষ বনগাঁয় যেতে ভয় পায় সেকালে হাজার হাজার মাইল পথ পরিক্রমা এবং নতুন উপনিবেশ স্থাপন ছিল মানব জাতিরই সুনির্দিষ্ট বিধিলিপি।

ইরকুটস্ক থেকে রুশরা আরও এগিয়ে যায় দুর্গম উত্তরে। তিনশ বছরের পুরনো এই শহরে নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সাইবেরিয়ার প্রাচীন ঐতিহ্যের। এই শহর থেকে লোকে দেখতে যায় লেক বৈকাল, যাকে বলা হয় সাইবেরিয়ার রত্ন। বিশ্বের গভীরতম (১৬২০ মিটার) এই হ্রদ নাকি বলটিক সমুদ্রের সমস্ত জল ধরে রাখতে পারে। আর স্বচ্ছতায় এর কাকচক্ষু জল নাকি হার মানায় স্ফটিককেও। এই বৈকাল হ্রদ

থেকেই যাযাবর পাখি প্রতি শীতকালে উড়ে যায় কলকাতায়। এই হ্রদের চার ভাগের তিন ভাগ মাছ আর প্রাণী বিশ্বের আর কোন জলাশয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। মস্কো থেকে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে প্রশান্ত মহাসাগরের দরজায় যদি পৌঁছতে চান তাহলে নভোসিবিরস্ক ইরকুটস্ক হয়ে চলে যেতে পারেন নাখোদকাতে। কিন্তু না, আমার যাত্রা আরও উত্তরে। সাইবেরিয়ার আরও দুর্গমে।

মধ্যরাতে ঘুম চোখে গিয়ে বিমানে বসেছিলাম। কখন যে বিমান ছাড়ল জানি না। যখন ঘুম ভাঙল তখন ব্রেক-ফাস্ট দিচ্ছে। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটে। কিন্তু নভোসিবিরস্কের সময় অনুসারে বেলা আটটা তখন।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রুশরা একটু অতিভোজী। ইওরোপে কন্টিনেন্টাল ব্রেক-ফাস্ট যেটি চালু আছে সেটি আসলে চা খাওয়া মাত্র। তার সঙ্গে জ্যাম জেলি কিংবা মাখন সহযোগে একটি ব্রেড রোল। ব্রেক-ফাস্টকে আহারের পর্যায়ে তোলে ইংরেজরা। কিন্তু ওদিকে তারা লাঞ্চে পুষিয়ে নেয় সামান্য কিছু মুখে দিয়ে পিত্ত রক্ষা করে। কিন্তু রুশীরা ব্রেক ফাস্টে যা খায় তা লাঞ্চেরই সমতুল্য। সাইবেরিয়ার সরুচাগলির মত দু-তিনটে রুটি জ্যাম জেলি দিয়ে এবং এক প্লেট চিজ ও সঙ্গে প্রচুর পাঁউরুটি রুটিন ব্রেক-ফাস্ট। এই সঙ্গে ডিম সেদ্ধ বা পোচ অবশ্যই থাকা চাই। প্লেনে অবশ্য প্রতিবারই ব্রেক-ফাস্টের সময় কোল্ড মিট-এসেছে।

ব্রেক-ফাস্ট শেষ হতে না হতেই প্লেন নেমে আসে মেঘের পর্দা ছিঁড়ে আরও মাটির কাছাকাছি। প্লেন থেকে সাইবেরিয়া মনে হয় এক বিরাট জলাভূমি। নিচের সবুজ প্রান্তর চৌচির হয়ে ফেটে বেরিয়ে পড়েছে অসংখ্য নদী উপনদী হ্রদ জলাশয়। অবশেষে ইয়াকুটস্ক বিমান বন্দর। আকাশ মেঘলা। তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেঃ।

যথারীতি একজন গ্রাউণ্ড অফিসার প্লেনে এলেন। প্লেনে বিদেশি আছে আগে থেকেই খবর চলে যায়। এসকর্ট করে তিনি আমাকে নিয়ে তুললেন বাসে। আমি, ল্যাথকিন ও এক ভদ্রমহিলা মাত্র এই

তিনজনকে নিয়ে বাস ছাড়ল। লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলেন নভোস্তির স্থানীয় করেসপণ্ডেট ভিক্টর। একবর্ণ ইংরেজি বোঝেন না। কিন্তু হাসিখুশি মানুষ। সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়েই আছেন। আমার জীবনে চরম আক্ষেপ, কয়েকদিন একসঙ্গে কাটিয়েও ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে পারলাম না।

ভাষা না জেনে কোন দেশ ভ্রমণ করার মত বেদনা আর নেই। বার বার অনুভব করি মূক কত বড় দুঃখী। অব্যক্ত বেদনার মত দুঃখ যেমন নেই, অব্যক্ত আনন্দের মত মনস্তাপও আর নেই। এ যেন মুখে কুলুপ আঁটা বন্দীর মত ঘুরে বেড়ানো। প্রতি পদে পদে আমি অনুবাদকের দাস। তার মর্জি মুড এবং বিশ্বস্ততার ওপর আমার অন্যের সঙ্গে সংযোগ নির্ভর করবে। আমার চোখ থাকতেও আমি অন্ধ, কান থাকতেও বধির। ভাষা থাকলেও আমি মূক।

ইয়াকুতিয়া অটোনমাস রাজ্যের রাজধানী ইয়াকুটস্কের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল মেঘমেদুর প্রভাতে। সাইবেরিয়ার ইয়াকুতিয়া অঞ্চলের আয়তন ভারতের প্রায় সমান। এই অঞ্চল ইয়াকুত জাতির মাতৃভূমি। তাও মোট জনসংখ্যার তারা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। মোট জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার। সেক্ষেত্রে ইয়াকুত অধিবাসীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। মূল ভূখণ্ড থেকে আসা রুশরাই এই অঞ্চলের মেজরিটি। এছাড়া সাইবেরিয়ার যত উন্নতি হচ্ছে ইউরোপীয় অংশ থেকে তত বেশি মানুষ আসছে। ইয়াকুত ছাড়াও ইয়াকুতিয়াতে আছে আরও কিছু কিছু খণ্ড জাতি।

যেমন উত্তরাঞ্চলে ইউকাগির উপজাতির বাস। যাদের সংখ্যা মাত্র ৮০০। অথচ এই ৮০০ উপজাতির জন্য লিপি ও সাহিত্য তৈরি হয়েছে। ইয়াকুত সাহিত্য তো আজ বেশ সমৃদ্ধ। প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ইয়াকুত মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করে। নবম ও দশম শ্রেণীতে রুশ মাধ্যম হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেকটি জাতিই তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারে। বিদেশী ভাষা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই স্কুলে শিখতে

হয় কিন্তু সে শুধু দায়সারা ভাবে। আমরা যেমন সংস্কৃত শিখি অনেকটা ঠিক সেই রকম। শুধু মুখস্থ করে কোন রকমে পাশ করা। তাতে যে কেউ এক বর্ণ ইংরাজি শিখতে পারেনি তা গোটা দেশ ঘুরলে বোঝা যায়। ইংরাজিতে একটি বাক্যও কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। ইয়েস নো ভেরি ওয়েল বোঝারও কারও ক্ষমতা নেই। যারা বিদেশি ভাষা শিখে কেরিয়র করতে চায় তারা বিশেষ ইনস্টিটিউটে গিয়ে ভরতি হয়। সেখানে বিদেশি শেখার সত্যিই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে। টেপের সাহায্যে বার বার উচ্চারণ রপ্ত করতে শেখানো হয়।

ইয়াকুরটস্কে আমরা যে হোটেলে উঠলাম তার নাম লেনা। নদীর নামে নাম। শহরটির বৈশিষ্ট্য হল গাছপালার সংখ্যা একেবারে কম। বহুতল বিশিষ্ট বাড়ির সংখ্যাও বেশি নয়। তবে চওড়া চওড়া রাস্তা, ফুটপাথ, স্কোয়ার। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব শহরেই যা থাকে একটি করে লেনিন স্কোয়ার যেখানে থাকে লেনিনের বিরাট মূর্তি, যাদুঘর, অপেরা, আঞ্চলিক সোভিয়েত, সিটি অফিস অর্থাৎ পুরসভা।

ভিক্টর শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন। বললেন: এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হল গোটা শহরের নিচে জমে রয়েছে বারো মাস বরফের স্তূপ। ভূতত্ত্বের ভাষায় এর নাম পারমাফ্রস্ট। এজন্য মাটির নিচে সরাসরি কোন ভিত খোঁড়া যায় না। প্রতিটি বাড়ি বসানো কয়েকটি পিলারের ওপর। পিলারের নিচের অংশ ড্রিল করে মাটির ভেতর বসানো যেমন তাঁবু খাটানোর জন্য খুঁটি পোঁতা হয়। তা সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালে বরফ যখন গলে তখন কোন বিশেষ দিকে চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তাই অনেক বাড়ির দেওয়ালেই ফাটল চোখে পড়ে।

ভিক্টর বলছিল এই পারমা ফ্রস্টের মধ্যে চাপা পড়া অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কিছু ম্যামথের অবিকৃত দেহ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরেও অবিকৃত ছিল তার মেদ অস্থি মজ্জা। কুকুর দিয়ে তাদের মাংস খাইয়ে দেখানো হয়েছে তা শুধু অবিকৃত ও সুস্বাদু নয়, এখনও তরতাজা। প্রকৃতি তার আপন বুকে সংরক্ষণের এমন আশ্চর্য হিমঘর তৈরি করে

রেখেছে যা এখানকার মানুষ এখন ব্যবহার করছে নিজের কাজে। মাটির নিচে হরিণের মাংস পুঁতে রাখার গল্প শুনেছিলাম। ইয়াকুতিয়াতে লোকে মাটির নিচে বরফের কূপ খুঁড়ে সেখানে সঞ্চিত করে রাখে মাংস। শীতের সঞ্চয়। শীতে যখন চারিদিকে বরফে যায় ঢেকে, যখন সঞ্চয় যায় ফুরিয়ে, যোগাযোগ যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তখন মাটির নিচের সঞ্চিত ধন পরিণত হয় পরম সম্পদে।

ইয়াকুৎস্কে মল্লযুদ্ধ

দুপুরবেলা ভিক্টর আমাদের নিয়ে গেলেন স্থানীয় স্টেডিয়ামে মল্লযুদ্ধ দেখাতে। সারা ইউ. এস. এস. আর.-এর জাতীয় মল্লযুদ্ধ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার সেদিনই উদ্বোধন। স্টেডিয়ামে তিল ধরবার জায়গা নেই। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝে কয়েক হাজার দর্শক বসে গোটা দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। প্রথমে ১৫টি রাজ্যের পতাকা বহন করে এলেন প্রতিযোগীতা। তাঁদের পিছনে জিপে করে এলেন বুকে বীরত্বের মেডেল ঝোলান প্রাক্তন সৈনিকেরা। তারপর শুরু হল জাতীয় পোশাক পরা ছেলে মেয়েদের সমবেত ব্যায়াম নাচ। শোভাযাত্রার পিছন পিছন দুহাতে সবুজ গাছের পাতা নিয়ে শোভাযাত্রা করে এল সুন্দরী মেয়েরা। এল ঘোড়ায় করে ইয়াকুতদের জাতীয় পোশাক পরা একটি পরিবার তার সন্তান সন্ততি নিয়ে। রাজবেশ পরা এক ইয়াকুত যুবক এলেন সুসজ্জিত ঘোড়ায় চেপে। তাঁকে বন্দনা করল ইয়াকুত নর্তকীরা। হাতে তাদের কাঠের কারুকার্যখচিত পাত্র। সেই পাত্রে করে প্রাচীন ইয়কুতরা ঘোড়ার দুধ খেত। নাচতে নাচতে সেই পাত্র তারা তুলে দিল উদ্যোক্তাদের হাতে। তারা দুধ খাওয়ার অভিনয় করে সেই পাত্র আবার ফেরৎ দিল।

এরপর উন্মোচিত করা হল ইয়াকুতদের শুভ কামনা সূচিত কারুকার্যখচিত কাঠের তিনটি স্তম্ভ। যে কোন শুভ কাজ উপলক্ষে তারা এই কাঠের স্তম্ভ স্থাপিত করে। রাজবেশ পরা তরুণটি গলা ছেড়ে গাইলেন লোকসঙ্গীত। প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলনের

পর বাজি ফাটল আকাশে। কতগুলি সোনলী আলোর ফুলকি ঝরে পড়ল মাটিতে। শুরু হল মল্লযুদ্ধের অনুষ্ঠান।

ইয়ারকুটস্কের যাদুঘরে

ইয়ারকুটস্কে ইয়াকুত যাত্নঘরে ঢুকলে ইয়াকুতিয়ার অতীত এবং বর্তমান এক সঙ্গে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। নৃতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করছেন সাইবেরিয়ার এই অংশে ২৫ লক্ষ বছর আগেও মানুষের জীবনের স্পন্দন আবিস্কৃত হয়েছে। আফ্রিকার অলডুয়াই সংস্কৃতির মত ইয়াকুত সংস্কৃতি সুপ্রাচীন।

ইয়াকুতিয়াতে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে তুঃসাহসী মানুষেরা আসতে শুরু করে সোনা ও হীরার খোঁজে। গত শতাব্দীতেই এখানে কয়লা তোলার কাজ শুরু হয়।

সাইবেরিয়ায় তুর্গম জঙ্গল ছিল মানুষের মৃগয়ার এক বড় ক্ষেত্র। মানুষ ল্যাসোর মত ফাঁস দিয়ে ধরত বন্না হরিণ। বন্য হরিণকে পোষ মানিয়ে তাদের দিয়ে বরফের উপর শ্লেজ গাড়ি টানাত। লোস হল সেই বন্না হরিণ। ফার্মে আজও যাদের হাজারে হাজারে পালন করা হয়। হরিণ ছাড়াও আছে চবুকু নামে এক বন্য ছাগল। আলিন নামে এক বিচিত্র শিঙের হরিণ। প্রচণ্ড শীতে ফসল খুব একটা হয় না বলেই প্রাণী হিংসার ওপরেই নির্ভর করছে মানুষের জীবন। সেই স্মরণাতীত কাল থেকে পশু মাংসই এখানকার প্রধান খাদ্য। দোকানে গেলে দেখা যায় থরে থরে সাজানো আছে পশু চর্মের পোশাক, জুতো, হরিণের মাথা বিক্রি হচ্ছে স্যুভেনির হিসাবে। এক একটির দাম প্রায় ভারতীয় মুদ্রায় হাজার টাকা।

ইয়াকুতদের প্রাচীন ধর্ম সোমানিজ। হিন্দুদের মত তারা বিশ্বাস করত ত্রিভুবনে। স্বর্গে ঈশ্বরের বাস, পাতালে অধিষ্ঠান রাক্ষসের, এই তুয়ের মাঝখানে মর্ত্যবাসী মানুষ। একমাত্র পুরোহিতরাই পারেন এই তিন ভুবনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে। ইয়াকুতদের প্রাচীন বাসগৃহের নিদর্শন আছে যাত্নঘরে। যেখানে তারা মাছের ছাল দিয়ে তৈরি তাঁবুর

মত ঘরে থাকত শীতকালে। দেখতে অনেকটা ঠিক টোপরের মত। স্থানীয় ভাষায় তার নাম ইয়োরতার। পাত্রে জল গরম হত সব সময়। কাঁচের বদলে স্বচ্ছ বরফ খণ্ড লাগিয়ে তাঁবুর জানলা হত।

সাইবেরিয়ার বিচ্ছিন্ন আদিম জীবনে আধুনিক ভাবধারার স্পর্শ নিয়ে এসেছিলেন জার আমলের নির্বাসিত বিপ্লবীরা। সাইবেরিয়ায় তখন একদিকে আদিবাসীরা বাস করেন চিরাচরিত জীবনধারার মধ্যে আত্মনিমগ্ন হয়ে। অন্যদিকে জারের সমস্ত প্রতিনিধি এবং খনি মালিকেরা চালায় সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার। নির্বাসিত বিপ্লবীরা শোষিত মানুষদের অগ্নিমন্ত্র দেন কানে। ইয়াকুতদের যে নেতা সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাঁর নাম ভসিলি মালচাল। উনিশ শতকে তিনি জন্মেছিলেন। আটবার কারাবরণ করেন তিনি। দুবার ওঁকে তক্তার ওপর বেঁধে চাবুক মারা হয়। যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে সেই নিপীড়নের চিহ্নটি।

বিপ্লব ইয়াকুতিয়াতে এসেছিল এক বছর পরে। কিন্তু বিপ্লবীদের শাসন স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক মাস। ইয়াকুতদের চারজন নেতা ছিলেন বিপ্লবের পুরোভাগে! কিন্তু আগেই বলেছি সাইবেরিয়া ছিল প্রতিবিপ্লবীদের শক্ত ঘাঁটি। ১৯১৮-২৩ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত ছিল সাইবেরিয়া। যুদ্ধ চলছিল হোয়াইট গার্ডদের সঙ্গে রেড গার্ডদের। রেড গার্ডদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জর্জিয়ান নেতা এ কে কানান্দারিশিরলি। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্ব দেন বৈকালভ। জারের সেনাপতি পিপিলাইয়েভ এগিয়ে আসছিলেন। আমগাতে তিনি নিহত হলেন। ১৯২৩ সালে সেটাই শেষ যুদ্ধ। তারপর মুক্তি। তারপর থেকে ঘুমন্ত সাইবেরিয়া, বিচ্ছিন্ন সাইবেরিয়াকে কীভাবে এক রাজ্য পাশে ঐক্য ও সংহতির মন্ত্রে গেঁথে দেওয়া হল, কীভাবে উদভ্রান্ত আদিম যুগের সাইবেরিয়ায় আধুনিক সভ্যতার আলো এল সে আর এক ইতিহাস।

নিরুংগ্রী : নবজাতকদের শহর

ইয়ারকুটস্ক শহরে আমার জন্য বিশেষ কোন প্রোগ্রাম ছিল না। ভিক্টর বললেন : এখান থেকে দূরে দুটি ছোট ছোট শহরে আমার প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে।

: দূরে মানে কত দূর ?

: আগামীকাল আপনি যাবেন নিরুংগ্রী টাউনশিপে। সেখানে দেখবেন কয়লা খনি। ইয়াকুটস্কের দক্ষিণে এই শহর। দূরত্ব এখান থেকে পাঁচশ কিলোমিটারের মত। আগামী পরশু যাবেন ইয়াকুতদের ঈশা পরব দেখতে সান্তার গ্রামে। দূরত্ব হাজার কিলোমিটার।

পরে জানলাম পাঁচশ বা হাজার কিলোমিটার সাইবেরিয়ায় কোন দূরত্ব নয়। প্রত্যেকটি ছোট ছোট শহরেই আছে এয়ারপোর্ট। ১৯২৬ সালে সাইবেরিয়ায় প্রথম উড়োজাহাজ নেমেছিল। সে সময় লটারি করে নির্বাচন করা হত কে উঠবে প্লেনে। আজ মাকড়শার জালের মত ছোট ছোট বিমান পথ সাইবেরিয়ায় বিস্তৃত। কোথাও প্লেনে যাত্রী ধরে ৪০ জন, কোথাও ৩০ জন। এমনকী ১০ জন যাত্রীর বিমান প্লেনও রয়েছে বাসের মত, ৪০-৫০ মাইল দূরে যাত্রী নিয়ে যায়। প্লেনের ভাড়াও ভারতের তুলনায় অনেক শস্তা। মস্কো থেকে ইয়াকুটস্ক সাত ঘণ্টার পথ প্রায় সাত হাজার কিলোমিটারের মত। ভাড়া ১৪০ রুবল অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ২২০০ টাকার মত।

প্লেন এখন সাইবেরিয়ার অধিবাসীদের কাছে বাসের মত। একজন সাইবেরিয়ান বালক বছরে অন্তত তিনবার প্লেনে চড়ে। ভারতীয় বিমান পথে লিভ ট্রাভেলের টাকা পাওয়া পদস্থ ব্যক্তি ছাড়া সপরিবারে বিমান ভ্রমন প্রায় অসম্ভব ঘটনা। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি বিমানেই আমি একা ভ্রমণ করতে কম লোককেই দেখেছি। প্রায় সবাই কাচ্চা-বাচ্চা পরিবৃত। নিরুংগ্রীর পথে আমরা ৪০ জন যাত্রীর বসার মত ছোট বিমানে করে সেখানে নামলাম সেটি একটি গণ্ডগ্রাম। পাশ দিয়ে চুলমান নদী। তাই নদীর নামে গ্রামের নাম। সেই গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে এয়ারপোর্ট। সাইবেরিয়ায়

এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশনের চেয়ে বেশি কিছু সাজানো-গোছানো ব্যাপার নয়। তবে ভি আই পি লাউঞ্জ একটা থাকবেই প্রতিটি এয়ারপোর্টে, যেখানে আমার মত অতিথিও সুদৃশ্য সোফায় বসে বিশ্রামের সুযোগ পাবে। এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন কেতাদুরস্ত ইউরোপীয় পোশাক পরা ইয়াকুৎসকুগোন-এর ডেপুটি ডিরেক্টর। ইয়াকুৎসকুগোন নিরুংগ্রী প্রজেকটের ডেপুটি ডিরেক্টর। নিরুংগ্রী এখান থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে। জায়গাটি একেবারে গ্রাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। চুলমান গ্রামে অবশ্য জনবসতি আছে। সবই কাঠের বাড়ি। ২০ হাজার লোকের বাস ওই গ্রামে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে আমরা এক হাজার মিটার ওপরে। সাইবেরিয়ার অরণ্যে রৌদ্রের শোভা অতুলনীয়। ঘন সবুজ গাছের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রোদ্দুর এসে পড়ে সবুজ ঘাসে। নানা ধরণের পাখির ডাকে সৃষ্টি হয় মায়াময় পরিবেশ।

বাটাকভ বলেছিলেন: নিরুংগ্রী মানে মৎস্যবহুল নদী। সেই নদীর ধারে আমাদের টাউনশিপ কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর মাছ পাওয়া যায় না। বলছিলেন: ইয়াকুটস্ক থেকে নিরুংগ্রী রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। আমুর বৈকাল রেল লাইন গিয়েছে এই শহরের ওপর দিয়ে।

বাটকভ রুশ বৈ দ্বিতীয় ভাষা জানেন না। একমাত্র কাজের কথা আর তথ্য ছাড়া অনুবাদকের মাধ্যমে খোশ গল্প করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার সহযাত্রী ল্যাংকিন আর একজন রুশ পেলে তার সঙ্গে অবিরাম রুশ ভাষায় গল্প করে যেতেই বেশি উৎসাহী। তাই চলমান জিপে করে সাইবেরিয়ার শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম।

অবশেষে এসে পৌঁছলাম নিরুংগ্রী টাউনশিপে। বিহার বা মধ্য-প্রদেশের পাহাড়ি এলাকার যে কোন প্রজেক্ট টাউনশিপের কথা স্মরণে আসে। ঘন গাছের জঙ্গলে ঢাকা এক নিরিবিলি অঞ্চলে ইনট্যুরিস্ট হোটেল। খুবই পরিচ্ছন্ন এবং ছিমছাম। এমনকী লাউঞ্জে রয়েছে টি. ভি-র সঙ্গে বিলিয়ার্ড টেবল যাতে মেড ইন ইউ. এস. এ. স্পষ্ট খোদাই

করা হয়েছে। নিরুংগ্রী হল কয়লাখনি শহর। কিন্তু এখানে কয়লাখনি অর্থে বেলচা নিয়ে ভূগর্ভে নামার ব্যাপার নেই। কয়লাখনি বলতেই ঝরিয়া আসানসোলের সেই চিরপরিচিত যে দৃশ্য ফুটে ওঠে তার সঙ্গে এখানকার কোন মিল নেই। কয়লা মানেই সেই বিবর্ণ হতশ্রী শ্রমিক বস্তি। রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর এত বেতন দিয়েও খনি শ্রমিকের পরিবেশের সামান্য উন্নতি হয়নি ভারতে। সেই ক্লেদাক্ত জীবন। মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। ট্রেড ইউনিয়নের লড়াই। চোরাই কয়লা পাচারকারী, ভাঁটিখানা, ট্রাক ড্রাইভার, গণিকাপল্লী, মহাজন।

এখানে অবশ্য সমস্ত কয়লা ওপেন কাস্টিং সিস্টেমে বার করা হয়। বড় বড় কয়লার পাহাড়। ওপরের পাথর কাটতে কাটতে যাও। ২০-২৫ মিটার নিচে থেকেই কয়লা। এই কয়লা কাটা আর কোল ওয়াশারিতে তাকে ঝাড়াই বাছাই ও পরিশ্রুত করা একে কেন্দ্র করেই এই প্রজেক্ট। সমস্ত মিলিয়ে দেড় লক্ষ লোকের টাউনশিপ।

মাত্র দশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টাউনশিপ। এর মধ্যে জমজমাট টাউনশিপ। এমনকী ইয়াকুটস্ক পর্যন্ত ৮৩০ কিলোমিটার রেল পথের কাজও শুরু হয়েছে।

নগর সোভিয়েতের চেয়ারম্যান একজন ইয়াকুত। অফিসে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। বললেন: এই শহরের দশ বছরের ইতিহাসে আপনি প্রথম ভারতীয় আমাদের শহরে এলেন। এই শহর ও প্রজেক্ট তৈরির জন্য ২'৫ বিলিয়ন রুবল (২৫০ কোটি রুবল) খরচ হয়েছে। বছরে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন হয় এখানে। উৎপাদনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে।

এই শহরে শীতকালে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রা নেমে যায়। তাছাড়া উত্তর দিক থেকে সমুদ্রের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে আসে। এই অবস্থাতেও আমাদের কাজ থেমে থাকে না। আবার গরমের সময় এখানে ৩০ ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠে। বছরে মাত্র ত্রিশ দিন এখানে প্লাস তাপমাত্রা। ১৫৭৫ সালের আগে এখানে সামান্য কয়লা উৎপাদন হত। একটি ছোট গ্রামের মত ছিল এখানে। ৯০০ লোকের

বাস ছিল তখন। আজ শুধু শহরের কেন্দ্রেই ৬০ হাজার লোক থাকে। কয়লা খনি ছাড়াও নিরুংগ্রী প্রাজেক্টের মধ্যে আছে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখন পর্যন্ত ২১০ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট কাজ করছে। তৃতীয় ইউনিট সমাপ্ত প্রায়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। তখন মোট উৎপাদন দাঁড়াবে ৬৪০ মেগাওয়াট। এই অঞ্চলে ৪০ বিলিয়ন টন কোকসিন কয়লার মজুত আছে। দু হাজার সালে বার্ষিক উৎপাদন গিয়ে দাঁড়াবে আড়াই কোটি থেকে তিন কোটি টন।

১৯২১ সাল থেকে আমুর-বৈকাল রেলপথ চালু হয়েছে। এখন মস্কো পর্যন্ত ট্রেনে চলে যাওয়া যায়। ওদিকে ভ্লাডিভস্টোক পর্যন্ত। এয়ারপোর্টের সম্প্রসারণ চলছে। ১৯২১ সালে বড় প্লেন নামতে পারবে।

নিরুংগ্রীর প্রকৃতি সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর। বছরের অধিকাংশ সময় এক ইঞ্চি ঘাস হয় না বন্ধ্যা মাটিতে। খাদ্য নেই, তাই পশুপালন ব্যাপক হারে সম্ভব হয় না এখানে। পশুখাদ্য আনতে হয় বাইরে থেকে। প্রজেক্টের নিজস্ব লাইভ-স্টক ফার্ম আছে মাংসের জন্য। তবে শিশুদের গুঁড়ো দুধ আসে। চিলিং প্ল্যান্টে বটলিং করা হয়। এই আবহাওয়ায় শসা ও টমাটো হয় না বলে ৬০ হাজার বর্গমিটার হট হাউস করে টমাটো শসার চাষ হচ্ছে। হট হাউস অর্থে হারবেরিয়ামের মত। সমস্ত এলাকাটি কাঁচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাতে আলো আসে অথচ বাইরের ঠাণ্ডা ভেতরে না আসতে পারে। সেই সঙ্গে বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে ভেতরের উষ্ণতা বজায় রাখা হয়। এই অঞ্চলে ইভেংকি আদিবাসীদের বাস। হরিণ পালনই তাদের উপজীবিকা। দশ হাজার হরিণের স্টেট ফার্ম আছে। তার আছে ফক্স ফার্ম। যাদের রোম থেকে জামাকাপড় হয়।

: ফক্স মানে শেয়াল? ল্যাংকিনকে জিজ্ঞাসা করি।

ল্যাংকিন বললেন: ফক্স মানে কলকাতায় ব্লু ফক্স রেস্তরাঁ। আছে না—সেই ফক্স।

আমি বললাম: ওই তো তার মানে শেয়াল—খেঁকশেয়াল।

ল্যারকিন বললেন: শেয়াল হবে কেন? শেয়াল মানে তো জ্যাকল।

যাই হোক বোঝা গেল কস্ত্র এক ধরনের রোমশ জন্তু। সাইবেরিয়ায় এই ব্যাপক পশু হত্যায় আমার মনে সায় দেয় না। সেখানে ঘোড়া, হরিণ থেকে শেয়াল লাখে লাখে সাবাড় হয়ে যায় মানুষকে খাদ্য আর চামড়া যোগাতে।

নিরুংগ্রী টাউনশিপ সম্পর্কে এক মজার কথা শোনালেন চেয়ারম্যান। বললেন: এখানে সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মানুষ এসেছেন। এখানে জন্মহার অত্যন্ত বেশি। মধ্য এশিয়ার মত। প্রতি এক হাজার জনসংখ্যা পিছু বছরে ২৭টি শিশু জন্মায়। এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য হল অনেকের এক সঙ্গে দু-তিনটি বাচ্চা পর্যন্ত হয়। গত বছর আমাদের ১৬টি যমজ শিশু জন্মেছে।

: এর কোন বিশেষ কারণ কিছু আবিষ্কার করেছেন?

চেয়ারম্যান বললেন: এখানকার লোকের জীবন নিশ্চিন্ত। আর্থিক সচ্ছলতা প্রচুর। তাছড়া জলহাওয়ার মধ্যেও কিছু নিশ্চয়ই একটা আছে। কারণ আমরা দেখেছি বয়স্ক দম্পতি যাদের আগে বাচ্চা হয়নি, এখানে আসার পর বাচ্চা হয়েছে।

চেয়ারম্যান বললেন: এখানকার লোকদের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। মাসে গড় আয় ৪৭০ থেকে ৪৮০ রুবল। অথচ জিনিসপত্রের দাম অন্য জায়গার সঙ্গে এক। কোন কোন জিনিস হয়ত দু-এক কোপেক বেশি পড়তে পারে। তবে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম এক। এখানে উৎপাদনশীলতাও যথেষ্ট। তিনবছর কাজ করার পর লোকে গাড়ি কিনছে। এই ছোট শহরে পাঁচ হাজার গাড়ি আছে। এর মধ্যে দু-তিন হাজার লোক দেশেও গাড়ি কিনে রেখে এসেছে। যখন ছুটিতে যায় তখন চড়ে। এই শহরে ছোট বাচ্চার সংখ্যা বেশি। ১৬ হাজার বাচ্চা পড়ে স্কুলে। আর ১৬ হাজার বাচ্চার বয়স এখনও স্কুলে যাবার মত হয়নি। নিরুংগ্রীতে দ্রুত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের দায়িত্ব সরকারের। কাজেই কর্মীদের

প্রত্যেককে ফ্ল্যাট দিতে হবে। প্রথম যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা থাকতেন কাঠের বাড়িতে। বাড়ি তৈরির জন্য সিমেন্ট কারখানাই তৈরি করা হয়েছে। সেখানে সিমেন্টের স্ল্যাব তৈরি করা হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত বাড়ি প্রিফ্যাবরিকেটেড। বড় বড় সিমেন্টের প্যানেল পর পর জুড়ে দেওয়া হয়। এতে সময় কম লাগে, খরচও কম। টাউনশিপে ৫০০ দর্শকের বসার সংস্কৃতিকেন্দ্র করা হয়েছে। ৮০০ দর্শকের একটি সিনেমা হল হচ্ছে। বাচ্চাদের জন্য আছে মিউজিক হল। ১২টি কিণ্ডারগার্টেন। সঙ্গে সুইমিং পুল। মস্কোর সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ। প্রত্যেক বছর একটি করে নতুন স্কুল হচ্ছে। দুটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি সাপ্তাহিক। আর একটি দ্বি-সাপ্তাহিক। দ্বি-সাপ্তাহিকের প্রচার ২২ হাজার।

প্রশ্ন করলাম: এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় এই প্রচণ্ড শীতের দেশে এই প্রজেক্ট। আপনাদের লোকজনের অভাব হয়েছিল কি?

চেয়ারম্যান জবাব দিলেন: প্রথম কয়েক বছর লোকজনকে যখন ক্যাম্পে থাকতে হত তখন লোক আসত, থাকতে না পেরে চলে যেত। এখন কিন্তু আর কেউ যেতে চায় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তা সত্ত্বেও সর্বত্র লোকাভাব। চারিদিকে কর্মখালির বিজ্ঞাপন। যদিও দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতি। তত্ত্বগত ভাবে বিশেষজ্ঞ তৈরির স্কুলগুলিতে যত প্রয়োজন তত লোকই নেওয় হয় তবু সেখানে আরও বেশি উপার্জনের তাগিদে অনেকে একাধিক বিষয় শিখে রাখে এবং সুযোগ বুঝে একটা চাকরি ছেড়ে আরও বেশি বেতনের চাকরিতে যাবার চেষ্টা করে। অপেক্ষাকৃত কম বেতনের চাকরিগুলিতে লোক পাওয়া আরও দুরূহ হয়। সাইবেরিয়ায় কাজ করলে বেতনের চেয়ে বেশি ভাতা দেওয়া হয়। এই ভাতার আকর্ষণে ও অল্প বয়সে গুরুত্বপূর্ণ পদের আকর্ষণে বহু তরুণ দুর্গম অঞ্চলে চাকরিতে আসছেন। নিরুংগ্রীর এই প্রজেক্টেই দেখলাম ত্রিশ বত্রিশ বছরের তরুণেরা চিফ ইঞ্জিনিয়ার অথবা বিভাগীয় প্রধানের কাজ করছেন।

নিরুংগ্রীতে যে কয়লা কাটা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ যন্ত্রের সাহায্যে।

এজন্য আনা হয়েছে ১৩০ টন, ১৮০ টনের অতিকায় দানবের মত ট্রাক। এই সব ট্রাকের কিছুটা তৈরি দেশের অভ্যন্তরেই। কিছু ট্রাক এসেছে জাপান থেকে, কিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই ধরনের ২১৫টি ট্রাক আছে। এক একটি ট্রাকের দাম দশ লক্ষ রুবল। ইঞ্জিনের ক্ষমতা আড়াই হাজার অশ্বশক্তির সমান। তিন টনের মত ডিজেল ধরে ট্যাংকে। কিন্তু ওই তিন টন তেলে ৫০ কিলোমিটার মাত্র যেতে পারে। তবে একটি ট্রাকের ১২ ঘণ্টা কাজের পক্ষে এটি যথেষ্ট। ২২৫ ঘণ্টা কাজের পর সার্ভিস করতে হয় ট্রাকগুলিকে।

ট্রাকের ড্রাইভাররাই মাইনার। তাঁরা প্রথমে গিয়ে স্বয়ংক্রিয় লোডার দিয়ে পাহাড় কেটে পাথরগুলো আগে সাফ করেন। তারপর কয়লা কেটে তোলেন। সমস্ত কাজই হয় যন্ত্রে। মাইনারকে শুধু বন্ধ দরজার কেবিনে বসে মেসিন অপারেট করতে হয়। বছরের সমস্ত সময় কাজ চলে। কাজ চলে সারাদিন সারারাত। প্রবল তুষারপাতের মধ্যেও কাজ কখনও থেমে থাকে না।

রুশ অর্থনীতির সাবলীলতার মূলে আছে এই অবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের গতি। একথা সত্যি, বহুক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উৎপাদন হয় না বা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় না। কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষ ও নানাবিধ ছুটিছাটার জন্য পুঁজিবাদী দেশে যেভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয় এদেশে তার কোন সম্ভাবনাই নেই। তিন হাজারের মত মাইনার অবিরাম কাজ করে ৯০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার খনিমুখ খুলে ফেলেছেন। এক অফুরন্ত জ্বালানি সম্পদের বিরাট উৎসমুখ খুলে গেছে। আপাতত কয়লা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যে এবং জাপানে।

কিণ্ডারগার্টেনে বাচ্চারা

নিকংগ্রীতে একটি কিণ্ডারগার্টেন দেখলাম। তিনতলা একটা প্রাসাদ। সুন্দর খাটে ঝকঝকে বিছানায় ফুটফুটে বাচ্চারা তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মাথা-খাওয়া সর্বনেশে মিশনারি শিক্ষা কবে যে দূর হবে তা ঈশ্বরই জানেন। এরা শিশুদের

ওপর বই এর বোঝা চাপিয়ে শুধু তাদের পুঁথিকীট করে তোলে। অল্প বয়সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তারা কিম্ভূতকিমাকার এক জীবে পরিণত হয়। পশ্চিমের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা শিশুদের জীবনে এনেছে ছন্দ গতি ও মিল। আনন্দ, খেলাধুলো ও বিশ্রামের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। এদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার সোপান। সে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর বয়স ছয় থেকে সাত করা হয়েছে। তার অর্থ শিশু আরও এক বছর থাকুক কিণ্ডারগার্টেনে। আড়াই বছর থেকে তার কিণ্ডারগার্টনে প্রবেশ।

প্রত্যেকটি ঘরে সৃজনাত্মক কাজ, হাতের কাজ, ছবি আঁকা ও ছবির বই এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কীভাবে স্বাস্থ্য পালন করতে হবে। পরিবেশকে ভালবাসতে হবে। সকাল সাতটার সময় মা বাবা ছেলেমেয়েকে দিয়ে যায় এখানে। এখানেই খাওয়া, স্নান, ঘুম, টিফিন। তারপর সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ি যায় তারা। কিণ্ডারগার্টেনের ভেতর বাচ্চাদের জন্য রয়েছে গরম জলের সুইমিং পুল। আর একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম বাচ্চাদের কীভাবে পথ চলতে হয় তার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ঘরের ভেতর ট্রাফিক লাইট করা হয়েছে। বাচ্চারা মোটর চালায়। রাস্তা পারাপার হতে শেখে। শেখে আইনকানুন মেনে গাড়ি চালাতে।

একটা ঘরে দেখলাম অতটুকুটুকু বাচ্চারা কী সুন্দর ছবি এঁকেছে। পুতুল গড়েছে, তৈরি করেছে কাঠের নৌকা ও জাহাজ। কিণ্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষা আমাকে বললেন: বাচ্চাদের আমরা প্রত্যেককে একটি করে টুল বক্স দিই। তা দিয়ে বাচ্চারা পছন্দ মত হাতের কাজ করতে শেখে। ছেলেরা যখন শেখে কাঠের কাজ, মেয়েরা শেখে সেলাই।

আমাকে অধ্যক্ষা তাঁদের ভিজিটার্স বুকে কিছু লিখে দিতে বললেন। আমি লিখলাম: শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এখানে শিশুদের যেভাবে ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তার প্রশংসা না করে পারি না।

সুন্দর আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন পশ্চিমী দেশেও আছে। আছে

ভারতেও। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের মধ্যে কোন শ্রেণী ভেদ নেই। একজন ডিরেক্টরের ছেলে ও একজন মজদুরের ছেলে একই কিণ্ডারগার্টেনে পাশাপাশি বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। এ দৃশ্য পুঁজিবাদী দেশে বিরল। সেখানে নির্ধন ও ও মধ্যবিত্তের ফারাক ঘুচে গেলেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান যথেষ্ট। শ্রেণী বৈষম্য সোভিয়েত ইউনিয়নে লুপ্ত হয়েছে গৃহ পরিবেশেও। সেখানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে অফিসার পাড়া বলে কিছু নেই। বিনয়নগর ও ডিফেন্স কলোনির মধ্যে যে গগনচুম্বী তফাৎ সে তফাৎ আছে গ্রীনউইচ ভিলেজ ও হার্লেমের মধ্যেও। কিন্তু একই ফ্ল্যাট বাড়িতে এক পাশে সামান্য শ্রমিক, আর এক পাশে ম্যানেজার বাস করছেন। ফ্ল্যাটের বণ্টন বেতন অনুসারে নয়, প্রয়োজন অনুসারে। বড় পরিবারের জন্য তিন কামরার ফ্ল্যাট, আবার ছোট পরিবারের জন্য দু-কামরা এক-কামরার ফ্ল্যাট।

হয়ত বিজ্ঞানী, শিল্পী, লেখক বা সামাজিক হিরোরা আবাসনের ব্যাপারে সুবিধা পান। শুনেছি একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বা নামী শিল্পীর পক্ষে চার কামরার ফ্ল্যাট কিংবা ব্যক্তিগত ভৃত্য রাখা কোন অসাধারণ ঘটনা নয়। কিন্তু সকলের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করার পর যোগ্যতা অনুসারে বণ্টনের নীতি মেনে নিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। মেনে নিয়েছে মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিগত উপভোগের মাত্রাকে সেই পর্যন্ত বাড়াতে পারে যে পর্যন্ত না তাকে অপরের শ্রমকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়। কিছু কিছু মানুষ প্রতিভাশালী। সমাজকে তারা দিচ্ছে অনেকগুণ বেশি। তার বিনিময়ে সমাজের কাছে তারা সঙ্গতভাবেই একটু বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দাবি করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন টাস্ক ফোর্স যেভাবে বাড়ি তৈরি করছে তা বিস্মিত হবার মত। দেশের সমস্ত মানুষকে মাথা গুঁজবার আশ্রয় দেওয়া এক বিরাট কর্মকাণ্ড। পৃথিবীতে কোন দেশই বলতে পারে না তাদের দেশে গৃহহীন কেউ নেই। যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে যে চরম গৃহ সঙ্কট গেছে তা সকলের জানা। নিরুশ্রীতে প্রতি সাত মাসে

একটি করে বৃহদায়তন ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে। প্রতি ফ্ল্যাট বাড়িতে ১৮০ থেকে ১৯০টি ফ্ল্যাট আছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটে আছে ফ্রিজ, গরম জল ও গ্যাস। সেণ্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটে।

যেসব কর্মী বাড়ি তৈরির টাস্ক ফোর্সে কাজ করছেন তাঁদের জন্য আছে ক্লাব। সেখানে তাঁর জামাকাপড় ছেড়ে কাজের পোশাক পরে নেন। ফিরে এসে স্নান করেন। এখানে তাঁরা লাঞ্চ খান, গল্পগুজব করেন। আমরা যে টাস্ক ফোর্সের ক্লাবে গেলাম সেখানে ১৪৫ জন মিস্ত্রী কাজ করেন এঁদের মধ্যে ৯ জন পার্টি সদস্য। ৮৩ জন সদস্য নন। শিক্ষা—হায়ার সেকেণ্ডারি শেষ করেছেন ৮ জন। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে পাস করেছেন ২০ জন। সেকেণ্ডারি পাস ,০৫ জন ও মিডিয়াম স্কুল পর্যন্ত পড়েছেন ১৬ জন।

এই ক্লাব হাউস খুব সুদৃশ্য না হলেও বিলিয়ার্ড টেবল পর্যন্ত আছে। এদেশে শ্রমসাধ্য কাজে বেতন অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে বেশি। তাঁদের জীবন যাত্রার মানও তাই উন্নততর। নিকংগ্রী থেকে ইয়াকুটস্ক ফেরার পথে ছোট্ট প্লেনে বসে আকাশের বুকে ভাসতে ভাসতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। বলাকার মত পাখা মেলে মেঘেরা উড়ছে। নিচে যতদূর তাকাও সবুজ। সোনালী রোদ্দুরে ঝকমক করছে রূপালি নদী। এক এক জায়গায় হ্রদ ভারতের মানচিত্রের রূপ ধারণ, করেছে। অজগরের মত কুণ্ডলী পাকান নদী, ধরণী ফেটে চৌচির হয়ে যেন সৃষ্টি অসংখ্য জলাশয়ের। যতদিন যাবে লুপ্ত হয়ে যাবে সবুজের এই সমারোহ। আদিম অরণ্যের বুকে জাগবে জনপদের চিহ্ন। বসুন্ধরার বক্ষ বিদীর্ণ করে রত্ন ভাণ্ডারের দুয়ার মানুষের কাছে খুলবে সেদিন। সত্যি হিংসা হয় এই দেশের ওপর।

ইয়াকুতাদের ঈশা পরব

পরপর তিন দিন ধরে সকালে উঠেই প্লেনে চেপে দূর দূর দেশ পাড়ি দিচ্ছি। ব্যাপারটি লোভনীয় এবং রোম্যান্টিক শোনালেও ক্লান্তিকর। পর্যটকের আনন্দ অনাবিল কিন্তু লেখক যখন পর্যটক হন

তখন তা তাঁর কাছে হয়ে ওঠে এক বিশেষ দায়িত্ব। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের নোট রাখতে হয়। তার ওপর সেটাকে সময়মত লিখে ফেলা এক বিরাট পরিশ্রমসাধ্য কাজ। আমার নিজের মতে লেখাও এক ধরনের শারীরিক পরিশ্রম। এতে মনোবল যতটা লাগে বাহুবল ঠিক ততটাই। সকালে উঠেই আবার এয়ারপোর্ট এবং এবার আমার গন্তব্য-স্থল প্রায় হাজার কিলোমিটার উত্তরে ইয়াকুতদের এক গ্রামে। গ্রামের নাম সন্তারা। ছোট প্লেনে করে যাত্রা। যাবার পথে মাঝের আর একটি গ্রামে প্লেন থামল। গ্রামের নাম নিউরবান। এবারে আমাদের সঙ্গী ভিক্টর। তিনটি ক্যামেরা কাঁধে করে পেশাদার ফটো-গ্রাফারের মত সে চলেছে নভোস্তি প্রেস এসেন্সির হয়ে ঈশা পরব কভার করতে। নিউরবান শহরের কম্যুনিস্ট পার্টির সেকেণ্ড সেক্রেটারি আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন।

বললেন : নিউরবানের লোকদের জীবিকা ঘোড়া আর গাই পালন। স্টেট ফার্মে কাজ করে সবাই। শতকরা ৮৫জনই ইয়াকুত।

আমি বললাম : আপনাদের পার্টির এখানে এখন কর্মসূচী কী?

সেক্রেটারি বললেন : ২৫ জুন থেকে আমাদের ঘাস কাটার প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। যত বেশি ঘাস কাটতে পারব তত বেশি পশুদের উপকার হবে। কারণ ন'মাস ধরে শীত। তাছাড়া এটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর। আগামী পার্টি কংগ্রেসের জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি।

এয়ারপোর্টটি গ্রামের রেল স্টেশনকেও হার মানায়। পাইলট এয়ার হসটেসদের বিশ্রামের জায়গা একটি কাঠের বাড়ি। এয়ারপোর্টে কোন দোকান নেই। কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই। শুধু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে। উত্তর ইয়াকুতিয়াতে এসে দেখছি এখানে এখনও খাটা পায়খানার প্রচলন রয়েছে।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে যাত্রীদের কুড়িয়ে নিয়ে আবার প্লেন ছাড়ল। চল্লিশ মিনিট পর আমরা এসে নামলাম সান্তারা গ্রামে।

সান্তারাতে সেদিন উৎসবের আমেজ। ইয়াকুতদের জাতীয় পরব

ঈশা উৎসবের সূচনা সেই দিন। ইয়াকুতিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ জন এসেছেন এই পরব দেখতে। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানালেন কেতাদুরস্ত স্যুটপরা একজন ইয়াকুত। নাম ভ্যাসিলি ইগনাটিয়েভ লোকাল সোভিয়েতের চেয়ারম্যান। বললেন: স্বাগতম আমাদের এই গ্রামে এই প্রথম একজন ভারতীয়র পদার্পণ ঘটল।

এয়ারপোর্টে উড়ছে সোভিয়েত দেশের পনেরটি রাজ্যের পতাকা। পাইন ও ঝাউগাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে গ্রামের মধ্যে। এয়ারপোর্টের সামনে সোফার চালিত বিরাট কালো ভলগা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। আমাকে চালকের পাশের আসনটিতে বসতে দিয়ে সম্মান দেখালেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা গ্রামের হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম। সুন্দর ছিমছাম হোটেলটি। কিন্তু দুঃসংবাদ, জল নেই। সে কারণে টয়লেট বন্ধ। হোটেলের পাশে মাঠের মধ্যে একটি খাটা পায়খানা আছে, সেটাই ওরা অক্লেশে দেখিয়ে দিলেন। তবে কাঁচের জারে পানীয় জল মিলল।

ঈশা পরব হল শীত অবসানে গ্রীষ্মকে আবাহনের পরব। এক কথায় ইয়াকুতদের জীবনে এ এক বসন্ত উৎসব। প্রতিবছর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক শনি-রবিবার এই পরব হয়। তবে কোন শনি-রবি হবে তা এক মাস আগে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি দেখে নির্ধারিত হয়।

ইশা পরবের দিন সারা গ্রামের মানুষ নতুন নতুন পোশাক পরে দুদিন ধরে মাতেন আনন্দোৎসবে। তাঁরা আসেন দলে দলে। গ্রামের এক প্রান্তে ঝাউ আর হোয়াইট ট্রি-এর জঙ্গল ঘেরা মাঠে উৎসবের আয়োজন। সেখানে মেলা বসেছে যেন। নানা ধরনের স্টল তৈরি হয়েছে। এক দম্পতি কামেরা নিয়ে বসে গেছেন.ফটো তুলছেন সকলের।

চেয়ারম্যান আমাকে মঞ্চের ওপরে নিয়ে গেলেন। মঞ্চে বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। চেয়ারমান তাঁর বক্তৃতা পাঠ করে গেলেন। ইয়াকুত ভাষায় বক্তৃতা এক বর্ণও বুঝলাম না। শুধু একজায়গায় আমার নাম ও পরিবর্তন-এর নাম বলাতে বুঝলাম তিনি

আমাকে জনতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর অনেকটা সেই ধরনেরই অনুষ্ঠান যা দেখেছিলাম ইয়াকুত-এর স্টেডিয়ামে।

প্রথমে মোটর সাইকেল করে এলেন ওয়ার ভেটারেনরা। সেই সঙ্গে স্থানীয় হিরোরা। এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক ওয়ার ভেটারেন এসেছেন। শুনলাম এই গ্রাম থেকে তিন হাজারের মত যুবক যুদ্ধে গিয়েছিল। ফিরেছিল মাত্র হাজার-খানেক। তারাই আজ বৃদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ তাঁদের বসিয়েছে গভীর শ্রদ্ধার আসনে। রুশ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীর আজ আর প্রায় কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনে দ্বিতীয় বিপ্লব। ওই যুদ্ধে পরাজয় হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন, গোটা পৃথিবীর বুকে সমাজতন্ত্রের রক্তপতাকা উড়ত কিনা সন্দেহ। ওই শোভাযাত্রা দলে যোগ দিয়েছিলেন দুটি বৃহৎ পরিবার। এক দম্পতির পাঁচটি আর এক দম্পতির ছটি ছেলেমেয়ে। ছোট বাচ্চাটিকে বাবা নিয়ে এসেছে পেরাম্বুলেটরে। অন্যেরা হেঁটে আসছে বীর দর্পে। এই দুই রমণীকে অধিক সন্তান প্রসবের জন্য দেওয়া হয়েছে বীর রমণীর শিরোপা। এরপর শুরু হল বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নাচ। লোকনৃত্যের জন্য সাইবেরিয়ার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। আমি একবার মস্কো ক্রেমলিনের মঞ্চে দেখেছিলাম সাইবেরিয়ার লোকনৃত্য। তাঁরা ছিলেন দক্ষ শিল্পী। আজ যারা নাচ দেখাচ্ছে তারা কঁচি কাঁচা কিশোর। তাদের সকলের নৃত্যছন্দে আছে অনেক ত্রুটি। ভঙ্গ হচ্ছে তাল। কিন্তু উৎসব মুখরিত এই দিনে সুদূর সাইবেরিয়ার এই আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে বসে আদিবাসীদের এই নৃত্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। ইয়াকুতদের অনেকের পরনেই আজ জাতীয় পোশাক। এই পোশাকে আছে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন। তাদের লম্বা ফ্রকে জরির কাজ। মাথায় বাঁধা লাল রিবনের ফেট্টি। মেয়েদের অধিকাংশেরই লম্বা চুল বিনুনি বাঁধা। জাপানিদের সঙ্গে ইয়াকুতদের সাদৃশ্য যথেষ্ট। প্রকৃতিগত মিলের ব্যাপারে আমি বলতে পারব না। তবে একটা বিষয়ে মিল আছে, বেশভূষায় তারা জাপানিদের মত ফ্যাশনেবল। প্রত্যেকের পরনে

কেতাদুরস্ত দামী পোশাক। জিনস্ আজ ক্রমশ ছেয়ে ফেলছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। তরুণ তরুণীদের কাছে জিনস্ প্রিয়; প্রিয় সংগীত এখন রক। লৌহ যবনিকার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের সংস্কৃতি এসে ঢুকছে সোভিয়েতের জনজীবনে। আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের অনুবাদ হচ্ছে। অবিশ্বাস্য রকমের বিক্রি তার। বিক্রি বাড়ছে ইংরাজি রেকর্ডের। যে গোয়েন্দা সাহিত্য বিপ্লবের পর সাহিত্যের অঙ্গন থেকে অদৃশ্য হয়েছিল আবার তা ফিরে এসেছে থ্রিলারের রূপ নিয়ে। অবশ্য সোভিয়েতের জনজীবনে পশ্চিমের মত টেনশন নেই। নেই মাফিয়া কবলিত আইন শৃঙ্খলার জীর্ণ অবস্থা। নেই প্রতিপত্তিশালী আতঙ্ক সৃষ্টিকারী দুষ্টচক্র বা হিন্দি সিনেমার বিগ বস' এর দল। পুলিশ যাকে ওরা মিলিসিয়া বলে তার উপস্থিতি সর্বত্র চোখে পড়ে। এমনকী ওই মেলার মধ্যে একটি অবজারভেটরি করে সেখানেও পাহারা দিচ্ছে মিলিসিয়া।

সান্তারা গ্রামের আবহাওয়া বড়র পীরিতির মত। ক্ষণেক হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ। যখন এসে পৌছলাম তখন বেশ শীত। কোটের নিচে তিনটে সোয়েটার চাপিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু মেঘ কেটে যেই রোদ্দুর উঠল অমনি সোয়েটার গায়ে রাখে কার সাধ্যি। আবার গরমে যেই ঘামছি, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বৃষ্টি। ওরা বলল: ঈশা পরবের দিন বৃষ্টি হওয়া খুব সৌভাগ্যজনক।

বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য গিয়ে বসেছি এক বুথের নিচে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টির মধ্যে কুস্তি প্রতিযোগিতা চলছে। এমন সময় জাতীয় পোশাক পরা মাথায় বাস্তিন্দা (পালকের টুপি) এক ইয়াকুত সুন্দরী এল আমার সঙ্গে আলাপ করতে। তার সহচরী আলাপ করিয়ে দিল। সুরা আজটেমেইভা। এই গ্রামের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীত গায়িকা এবং স্কুল শিক্ষিকা।

ল্যাংকিন অনুবাদ করে দিলেন।

: আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করে প্রীত হলাম কুমারী আপনি কী বিষয়ের উপর গান করেন?

: যে কোন বিষয়। কুমারী আজটেমেইভা রুশ ভাষায় জবাব দিলেন। যদি বলেন আপনার ওপর আমি একটি সঙ্গীত রচনা করে গাইতে পারি।

: তাহলে তো খুব ভালই হয়।

: এখনই গাইব?

: এখনই। আবার যদি দেখা না হয়।

আজটেমেইভা গাইতে শুরু করলেন। তার বঙ্গানুবাদ হল: হে ভারতীয়, আমাদের এই গ্রামে তোমায় স্বাগত জানাই। আমাদের গাছপালা নদী সবই তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

আজটেমেইভা বললেন: আমি শুধু এক কলি গাইলাম। এইরকম অন্তহীন গাইতে পারি। যে গানের কোন শেষ নেই।

ওদিকে সামনে কোমর ধরাধরি করে একদল বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা নাচছিল ও গাইছিল। সারা রাত ধরে নাকি আজ নাচ গান চলবে। ও গানেরও কোন শেষ নেই। শুরুও নেই। কারণ যে কোন তাৎক্ষণিক বিষয়ের ওপর মুখে মুখে এক কলি গাইছিল তারা।

ঘোড়ার মাংস, ঘোড়ার দুধ

লাঞ্চের সময় চেয়ারম্যান আমাদের পাশের মাঠটিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে রান্না মাংস বিক্রি হচ্ছে। বড় বড় শিক কাবাব কিনে খাচ্ছে সকলে। আমাদের একটি কাঠের তৈরি বুথে নিয়ে যাওয়া হল। সেটি একটি ভি. আই. পি. রেস্টুরেন্ট। সুদৃশ্য টেবলে ধবধবে শাদা টেবলক্লথ পাতা। তার ওপর সুদৃশ্য প্লেট, ছুরি কাঁটা। সামনে সাজান আছে শিক কাবাব। আর দুরকম মাংসের প্রিপারেশন। কিছুক্ষণ পরে ওয়েটার এসে গেলাসে ঢেলে দিয়ে গেলেন ঘোড়ার দুধ। আর দিলেন শসার স্যালাড সাদা সসের সঙ্গে। চেয়ারম্যান বললেন: আজকের দিনে আমরা সবাই ঘোড়া খাই।

: তার মানে?

: তার মানে প্রথমে ঘোড়ার দুধ দিয়ে শুরু করব। তারপর এই

টেবিলে রয়েছে ঘোড়ার মাংসের যাবতীয় প্রিপারেশন। সেগুলিই আমরা খাব।

পৃথিবীতে অধিকাংশ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা শোচনীয় পর্যায়ের। সেইজন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করি। কিন্তু আজকের শিক্ষা আমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি শুনেছিলাম যুদ্ধের সময় জার্মানরা ঘোড়ার মাংস খেত। কিন্তু সাইবেরিয়ায় ঘোড়ার মাংস যে প্রধান খাদ্য এবং শূকর, গরু, মুরগির মত ঘোড়া পালন করা হয় খাদ্য হিসাবেই তা আমার জানা ছিল না। ঘোড়ার মাংস কীরকম লাগে তা টেস্ট করার অভিজ্ঞতাও মূল্যবান।

ঘোড়ার দুধ না বলে তাকে ঘোল বলাই ভাল। পাঁউরুটি দিয়ে ফারমেনটেশন করা। খেতে লাগল ঠিক ঘোলের মত। অনেকে আকণ্ঠ পান করলেন।

চেয়ারম্যান বললেন : এখানে প্রচলিত প্রবাদ, যদি একা থাকো তাহলে ঘোড়ার দুধ বেশি পান কোর না। ঘোড়ার মাংস দাঁতে কেটে দেখলাম অনেকটা বিফের মতই। এর মধ্যে খিদের জ্বালায় কিছুটা কাবাব গলাধঃকরণ করতেই হল। কারণ ঘোড়ার মাংসের একমাত্র অনুপান কিংবা বিকল্প কয়েক টুকরো শসা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এক সঙ্গে তিনটি বাচ্চা-প্রসবকারীর সঙ্গে

চেয়ারম্যান ভ্যাসিলি ইগনাটিয়েভ ঝিনুই নদীর ধারে তাঁর বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন। ওই বাড়িতে তিনি তাঁর বৈকালিক চা ও সেই সঙ্গে ময়দা দিয়ে তৈরি ডালের বড়ার মত এক ধরনের খাবার খাওয়ালেন। নদীর ধারে তাঁর ডুপলে বাড়ি। নিচে তিনখানা, ওপরে তিনখানা ঘর। পিছনে স্টোর রুম। মাটির নিচে পারমাফ্রস্টে শীতের মাংস রেখে দেবার ব্যবস্থা আছে। তাঁর স্ত্রী বাড়ি নেই। নিজেই পরিবেশন করলেন। ইগনাটিয়েভ আগে পার্টির কাজ করতেন। এখন আড়াই বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর অফিসটিও বাড়ির কাছে।

আমাদের দেশের ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মত তাঁর ক্ষমতা। কিন্তু জেলা শাসকের যে হাঁক-ডাক তেমন তাঁর নেই। তিনি যে ওই এলাকার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, ১৬টি দফতর তাঁর অধীনে, সেটি তাঁর সঙ্গে সারাদিন ঘুরেও বোঝার উপায় নেই। কেউ তাঁকে দেখে তটস্থ হচ্ছে না। সেলামও দিচ্ছে না। এমনকী কোন চামচেকেও চারপাশে ঘুরতে দেখলাম না। বক্তৃতা দিয়ে তিনি যখন নেমে ভিড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তখন ভি. আই. পি. সুলভ কোন বিশেষ খাতির তাঁকে পেতে দেখলাম না। আমাদের একজন পঞ্চায়েত প্রধান তো তাঁর এলাকায় রাজসম্মান পেয়ে থাকেন। চা পানের পর চেয়ারম্যান আমাদের ঘোড় দৌড়ের মাঠে নিয়ে গেলেন। গ্রামে সব বাড়িই কাঠের। সরকার থেকে জমি দেওয়া হয়েছে। যে যার বাড়ি করে নিয়েছে। কাঠও শস্তা। এই অরণ্যভূমি থেকে স্টিমারে করে কাঠ যাচ্ছে দেখলাম।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। চেয়ারম্যান বলতেই দুটি ছোট ছেলে উঠে গিয়ে আমার ও ল্যাংকিনের জন্য জায়গা করে দিল।

দফায় দফায় খেলা শুরু হল। এক এক দলে পাঁচ ছজন করে ঘোড়সওয়ার। ট্র্যাকটি কলকাতার রেসকোর্সের মতই আয়তনে বড়। দর্শকদের উল্লাস ও অশ্বক্ষুর ধ্বনিতে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল নিস্তব্ধতা।

আমার পাশে বসে দুই তরুণী। একজন অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখিয়ে রুশ ভাষায় কী বলে যাচ্ছেন ল্যাংকিনের সঙ্গে।

ল্যাংকিনের সব কথা অনুবাদে আপত্তি। উনি বলেন: যতবার অনুবাদ করেন ততবার ওঁর স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে। সেজন্য নেহাৎ প্রয়োজনীয় কথা না হলে উনি অনুবাদ করতে চান না। কিন্তু মেয়েটি যখন আমার বাংলায় লেখা অটোগ্রাফ চাইল তখন ল্যাংকিন আর অনুবাদ না করে পারলেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী নাম?

: আমার নাম কালিমা আর আমার সখীর নাম নাস্তায়া।

আমি বাংলায় লিখে দিলাম—কালিমা ও নাস্তায়াকে এক মধুর

গোধূলিতে।

কথায় কথায় কালিমা বলল : জানো, নাস্তায়ার এক সঙ্গে তিনটি বাচ্চা হয়েছে।

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কালিমারও দুই জমজ সন্তান। নাস্তায়ার হয়েছে একসঙ্গে দুই ছেলে এবং এক মেয়ে।

নাস্তায়া বলল, তার স্বামী স্যানিটারি ডাক্তার। সে স্কুলে পড়ায়। কর্ম উপলক্ষে তারা থাকে ৫০ মাইল দূরে আমগিনিস্কি শহরে। এখানে তার শ্বশুর-বাড়ি। শ্বশুর শাশুড়ির কাছে এসেছে পর্ব উপলক্ষে। এতদিন বাচ্চারা ছোট ছিল বলে কোথাও বেরুতে পারেনি।

: তোমার বাচ্চাদের কি এক রকম দেখতে হয়েছে ?

: দুই ছেলে একেবারে এক রকম। মেয়ে একেবারে অন্যরকম।

আরও দু'চার কথা বলে ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে গেলাম মূল উৎসব প্রাঙ্গণে। সেখানে মেয়েদের বেশি ভিড়। একটি স্কেটিং রিং-এর উপর পীতবসনা বাচ্চা মেয়েরা অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছে। সেই সঙ্গে ছোট ছোট মাটির হাঁড়ি আর মশালের মত দুধের পাত্র নিয়ে নাচল ছোট ছোট মেয়েরা। সব চেয়ে ভাল লাগে ওদের পোশাক। মেয়েদের সঙ্গে এল ছেলেরা। তাদের পরনে কারুকার্য করা পাঞ্জাবি। পরনে রঙিন চোস্ত। সারা রাত ধরে এই নাচ চলবে।

আবার ঘোড়ার ডিনার

লাঞ্চে যে পেট ভরেনি সে কথা বলাই বাহুল্য। ডিনারে সেটি পুষিয়ে নেবার প্রত্যাশা ছিল। শুনলাম স্থানীয় এক ভদ্রলোক আমাদের রাত্রে ডিনার খেতে বলেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারম্যান তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। প্রায় সাত কাঠা জায়গার ওপরে সুন্দর কাঠের বাড়ি। বাইরে জুতো খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। গৃহস্বামী এক তরুণ ইয়াকুত। নাম ভসিলি স্পিজিভোলভ। স্ত্রীর নাম শ্বেতলানা। গৃহস্বামীর বয়স ত্রিশ। তিনি স্থানীয় স্টোর্সে কাজ করেন। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করেছেন।

পত্নী অ্যাকাউনটেন্ট। ১৯২১ সালে ওঁদের বিবাহ হয়েছে। ওঁদের ছেলে আছে। বয়স ছয়। ছেলের নাম গ্রেগরি। বাড়ি করেছেন বছর-পাঁচেক। বাড়িটি বেশ প্রশস্ত। রান্নাঘর, দুটো শোবার ঘর। ঢুকতেই একটি ঘরে জিনিসপত্র, জুতো রাখা যায়। ভেতরে বিরাট ডাইনিং কাম সিটিং রুম। বেশ সুন্দরভাবে সাজান স্টিরিও, ফ্রিজ। সুদৃশ্য বুককেসে ক্লাসিক্স।

: বাড়িটি করতে কত খরচ পড়েছে ?

বললেন : বেশি নয়। কাঠ এখানে শস্তা। আমার বাবা মা ভাইরা সবাই মিলে নিজেরাই করেছি। কোন মিস্ত্রি লাগেনি। যা হিসেব দিলেন ভারতীয় মুদ্রায় ৭৫ হাজার টাকার মত।

ভসিলি ৩০০ রুবল মাসে পান। শ্বেতলানাও ৩০০ রুবল আয় করেন। পাঁচ বছরের ওপর কাজ করলে মাইনে ওদেশে দ্বিগুণ হয়ে যায়। বছরে ছুটি ৪৮ দিন। তা বাদে সপ্তাহে দু দিন ছুটি। তবে ছুটিছাঁটায় বাইরে যাননি। একটা গাড়ি কিনেছেন। গাড়ির জন্য গ্যারেজও তৈরি করছেন।

: ছুটির সময় কী করেন ?

: বাগানের ঘাস কাটতে, বাড়ি মেরামত করতে, ছুটি ফুরিয়ে যায়। গত বারো বছর ধরে চাকরি করছেন। মা ও তিন ভাই কাছেই থাকেন। এ ছাড়া আছেন দুই বোন। এক বোন পরব উপলক্ষে ভাই-এর বাড়ি এসেছেন। শ্বেতলানারা সাত ভাই বোন। তিনি তৃতীয়। খেতে বসলাম। কিন্তু এখানেও আহার্য সেই একই ঘোড়ার দুধ, ভদকা, ঘোড়ার কাবাব, ঘোড়ার স্টেক, ঘোড়ার রোস্ট, ঘোড়ার—থাক, আর প্লেটের দিকে তাকাতে পারলাম না।

খাওয়া শেষ হতে চেয়ারম্যান বললেন : আমার একটা টোস্ট আছে। এই বলে তিনি একটি ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। আজ আমাদের দেশে প্রথম একজন ভারতীয়ের পদার্পণ ঘটায় আমরা ধন্য মনে করছি। ভারত মহান দেশ। আমাদের বন্ধু। ভারতের সঙ্গে

আমাদের আত্মিক যোগ চিরকালের।

আমি বললাম : ইয়াকুত জাতির সারল্য, প্রীতি ও ভালবাসা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

শ্বেতলানা বললেন : যদি আমাদের দেওয়ালের ওই ছবিতে বাংলায় কিছু লিখে দেন।

দেওয়ালে টাঙান ছিল একটি কাঠের ওপরে আঁকা ছবি। তার পাশে ফেল্ট পেন দিয়ে বড় বড় করে বাংলায় লিখে দিলাম : এই পরিবারের জন্য আমার চিরদিনের চিরকালের শুভেচ্ছা রইল।

শ্বেতলানার ননদ রুশ ভাষায় লেখা মায়াকোভস্কির একটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এসে বললেন : এই বইতে বাংলায় কিছু লিখে দিন।

আমি লিখে দিলাম—মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।

ভসিলি আমাকে ও ল্যাংকিনকে কাঠের একটি কারুকার্য করা ঘটি উপহার দিলেন।

আমি বললাম : আমি যতদিন বেঁচে থাকব এই উপহার আমাকে মনে করিয়ে দেবে ইয়াকুতিয়ার কথা। আপনাদের সান্তারা গ্রামের কথা।

ঘোড়ার মাংসে ভরা পাত্রগুলির দিকে করুণ চোখে তাকাচ্ছিলাম। কোনক্রমে স্টেকটা খাওয়া শেষ করেছি।

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। পেটের ভেতর ঘোড়দৌড় শুরু হয়েছে। অ্যানিমাজেল বলে একটি বুলগেরিয়ান অ্যাসিড নিরোধক ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই। প্রবল ঘৃণার সঙ্গে যাকে গ্রহণ করেছি সে আমার জঠরে কিছুতেই থাকতে রাজি নয়। প্রবল শব্দে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল সেই পথেই।

আমি উন্মাদের মত হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাজপথে। ঘরের টয়লেটে চাবি দেওয়া।—জল নেই।

৩ চারবার ওয়াক তুলে শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে আমি সুস্থ

হলাম। ঘড়িতে রাত তিনটে। কিন্তু উজ্জ্বল দিনের আলোয় চারিদিক আলোকিত। আজ তো দীর্ঘতম দিন। দিনের আয়ু আজ এখানে ফুরোবে না। গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে এখানে চব্বিশ ঘণ্টা দিনের আলো। এ কেমন দেশ যেখানে নামে না রাতের অন্ধকার। যেখানে রাত্রির সুদীর্ঘ তপস্যা নেই দিবালোকের জন্য। যেখানে নিরন্তর সব কিছু স্পষ্ট, উদ্ঘাটিত, স্বচ্ছ এবং প্রকাশ্য।

আমি একা একা হাঁটতে শুরু করলাম ঝিনুই নদীর তীর ধরে। নদীর তীরের বাড়িগুলির দরজা বন্ধ। বৃদ্ধরা নিদ্রামগ্ন। তরুণ তরুণীরা আজ সারা রাত ধরে যৌবনের মহোৎসবে মাতাল। বিরোজা গাছের মর্মর ধ্বনির মাঝে গানের সুর ভেসে আসে। আরও দূরে আরও দূরে হেঁটে চলেছি। সব সঙ্গীত যেন থেমে গেছে ইঙ্গিতে। আমি একা। মনে হচ্ছে কুমারী পৃথিবীর বুকে এই মাত্র জন্ম হল সাইবেরিয়ার। আর সেই কুমারী সাইবেরিয়ার বুকের ওপর প্রথম মানুষের পদচিহ্ন আমিই এঁকে দিলাম যেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

উদ্যান নগরী মস্কো

সোভিয়েত ইউনিয়নে নগরপরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল নগরজীবনের উষরতার মধ্যে সবুজের সমারোহ। এর মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে যায় মস্কো। উদ্যান নগরীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পৃথিবীতে আরও দেখেছি—ওয়াশিংটন, নানজিং, বন কিন্তু মস্কোর নগর বিন্যাসের তুলনা মেলা ভার। বিরাট চওড়া চওড়া রাস্তা। তারপর দুদিকে দুসারি তরুবীথির মধ্য দিয়ে চলে গেছে সাইকেল ট্রাক। বিরাট বিরাট ফুটপাথ। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে পরিকল্পনা মত। গোটা শহর আবার ঘেরা গ্রাণ বেল্ট দিয়ে। মনে আছে প্রথমবার যখন মস্কো এলুম, শহরেব নিচে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে প্লেন, তখন জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখছি চারিদিকে গভীর গহণ অরণ্য। এই অরণ্যের মধ্যে মধ্যে যে অত বড় একটা শহর লুকিয়ে আছে তা কে বলবে।

মস্কোতে আমি এ পর্যন্ত তিনবার গিয়েছি। একটি প্রাণবন্ত শহরের লক্ষণই হল বহু দর্শনেও তা পুরনো হয় না, বরং প্রতিবারই তাকে নতুন লাগে।

মস্কো শহরের সৌন্দর্য তার মস্কোভা নদী। নদীতো অনেক শহরের মাঝেই রয়েছে—লণ্ডন, গ্লাসগো, প্যারি, বুদাপেস্ত, কায়রো, কলকাতা, গোয়াংচো সাংহাই। কিন্তু মস্কোভা নদীর বৈশিষ্ট্য, ছোট্ট নদীটি যেন পটে আঁকা ছবিটি। নদীর তীর কলকারখানার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নয়।

মস্কো শহরের আয়তনও বিশাল। উত্তর থেকে দক্ষিণ ৪০ কিলোমিটার আর পূর্ব থেকে পশ্চিম ৩৫ কিলোমিটার। এর আয়তনের তুলনায় কলকাতা যেন শিশু। গোটা মস্কো ১০৯ কিলোমিটার সার্কুলার রেল দিয়ে ঘেরা। জনসংখ্যার দিক থেকে মস্কো বিশ্বের চতুর্থ শহর।

মস্কোর আর একটি বৈশিষ্ট্য শহরের অধিকাংশ এলাকায় গেলে মনে হবে না যে এই শহরের বয়স ৮০০ বছর।

মস্কো শহরের গঠন গোলাকৃতি। গাছের গুঁড়িতে যেমন অনেকগুলি গোল জাল থাকে মস্কোও তেমনি। ঠিক মাকড়শার জালের মত বৃত্ত। কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত আবার ছত্রাকার নানা পথরেখা। ক্রেমলিনকে যদি বৃত্তের কেন্দ্র ধরা যায় তাহলে ক্রেমলিনকে ঘিরে রয়েছে পাঁচটি বলয় বা রিং। পুরাতন মস্কো ছিল প্রাচীর ঘেরা শহর এবং নির্দিষ্ট দরজা পার হয়ে তবেই আসা যেত দুর্ভেদ্য ক্রেমলিনে।

বিশ্বের মধ্যে এই একটিমাত্র শহর যেখানে ১৯৩০ সাল থেকে কোন বেকার নেই। ৪৮ শতাংশ লোক কাজ করে শিল্পে। ৩০ শতাংশ বিজ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কলা দপ্তরে, ৮ শতাংশ পরিবহণ শিল্পে, ৫ শতাংশ গৃহনির্মাণে ১০ শতাংশ সার্ভিস ইনড্রাস্ট্রিতে।

এই শহরের অধিবাসীর তিনলক্ষ বিজ্ঞানকর্মী না হয় বৈজ্ঞানিক। ৭৬টি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে এই শহরে যার ছাত্র সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার।

১৮ হাজার ছাত্র ছাত্রী পড়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে। শহরের ৬০টি যাদুঘরে বছরে এক কোটি সত্তর লক্ষ দর্শক সমাগম হয়।

৩২টি থিয়েটার আছে মস্কো শহরে। আছে ১৩টি কনসার্ট হল, দুটি সার্কাস, ১০০টি সিনেমা, সবশুদ্ধ ৫৩৬টি হলে সিনেমা দেখানো হয়, ৪০০শ্রমিক ক্লাব, অডিটোরিয়াম। দু লক্ষ মস্কোবাসী নিয়মিত অংশ নেয় সাংস্কৃতিক কাজকর্মে।

মস্কো শহরের ৪৫০০টি গ্রন্থাগারে এখন বই ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা ৩০ কোটি। প্রতি বছর মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৮,৫০০ মিলিয়ন কপি সংবাদপত্র, দু হাজার মিলিয়ন কপি ম্যাগাজিন। এই শহর থেকে ছাপা হয় বিখ্যাত প্রাভদা, দিনে যার প্রচার সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। প্রতিদিন মস্কোবাসী ৯০ লক্ষ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের নিয়মিত গ্রাহক। ৪০ লক্ষ কপি খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন বিক্রি হয় কিয়সক থেকে।

মস্কো শহরের স্মৃতি স্তম্ভের সংখ্যা ২৪০০টি। এর মধ্যে ১৫০টি কারখানা, বাড়ি বা অফিস আছে যেগুলি লেনিনের স্মৃতি বিজড়িত।

মস্কো শহরে ১২০০টি স্কুলে নয় লক্ষ ছেলে মেয়ে পড়ে। আরও ৯০ হাজার শিল্প শ্রমিক সন্ধ্যার পর পড়াশোনা করে। ৩০০টি বৃত্তি শিক্ষার স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা তিন লক্ষ।

মস্কোতে ৬৬ হাজার চিকিৎসক আছেন। আছেন ১,১৭০০০ হাজার প্যারামেডিকেল কর্মী। ১৬০টি হাসপাতাল এবং ১১৫০০০টি শয্যা। মস্কোর পুনর্নির্মাণ শুরু হয় ১৯৩৫ সাল থেকে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর মস্কোর উন্নয়নের জন্য গঠিত হয় দশশালা পরিকল্পনা। ১৯৫১ সালে প্রথম শুরু এই পরিকল্পনার।

মস্কো শহরে গাছের পর দর্শনীয় হল অ্যাপার্টমেন্টের সারি। স্থাপত্য রীতিতে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু তার সংখ্যা বিশাল। প্রতিবছর সেখানে তৈরি হচ্ছে ১,১২০০০ করে ফ্যাট এবং এইসব ফ্ল্যাট নাগরিকেরা পান বিনা সেলামিতে বা এককালীন টাকা দেওয়া ব্যতিরেকেই।

মস্কোর পথে পথে আমি প্রতিবারই ঘুরে বেড়িয়েছি উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। দেখেছি অসংখ্য মানুষের মিছিল।

তিনবার সফরের মধ্যে একবার কনডাকটেড ট্যুরে দেখে নিয়েছি দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলি। তার মধ্যে প্রথম তালিকায় ছিল ক্রেমলিন। মস্কোতে এসে ক্রেমলিন না দেখে ফিরে যাওয়া যেন আগ্রা এসে তাজমহল না দেখে চলে যাওয়া, অথবা লণ্ডন এসে বাকিংহাম প্যালেশ না দেখা। সেই ক্রেমলিন দিয়েই শুরু হোক পাঠকের মস্কো দর্শন।

মস্কোর রেড স্কোয়ার অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। মস্কো থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দিকে যত রাস্তা গিয়েছে তা সব এসে মিশেছে এই রেড স্কোয়ারে। রেড স্কোয়ার যেন সমস্ত পথের

সঙ্গম। জারের আমলে এখানে এলেই পাওয়া যেত দেশের নানা খবরা-খবর। কত হাঙ্গামা, রাষ্ট্রবিপ্লবের সাক্ষী এই স্কোয়ার। এখানে বিজয়ী রাজারা আয়োজন করতেন উৎসব অনুষ্ঠানের। এখানেই জারের জহ্লাদরা বিপ্লবীদের গিলোটিন করেছিল। আবার বিপ্লবের পতাকা উড়ে ছিল এখানেই।

১৯১৭ সালের শরৎকালে জারের সমর্থকদের সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই বাঁধে এই রেড স্কোয়ারেই। ১৯১৮ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিন এই রেড স্কোয়ারে প্রথম ভাষণ দেন। ১৯১৯ সালের মে দিবসের অনুষ্ঠানে এই রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে লেনিন বলেছিলেন, এ পর্যন্ত আমাদের শিশুরা বড় হয়ে যা দেখবে মনে হবে রূপ কথা। কিন্তু কমরেড আজ আপনারা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রাসাদের ভিত্তি রচনা করেছি আমরা। আজ আর এটি আকাশকুসুম কল্পনা নয়। আমাদের ছেলেরা আরও বড় রকমের উৎসাহ নিয়ে এই সৌধ গড়ে তুলবে।

এখন মে দিবসে ও ৭ই নভেম্বর তারিখে শ্রমিকেরা এখানে মার্চপাসট করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪ জুন বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয় উৎসব পালিত হয়েছিল এই রেড স্কোয়ারেই। ১৯২১ সালের ১৪ এপরিল রেড স্কোয়ারে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনের সম্মানে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভ্যালেনটিনা তেরেসকোভা। প্রতিবছর জুন মাসে স্কুল ছুটির আগে মাধ্যমিক স্কুলের ছেলে-মেয়েরা রেড স্কোয়ারে এসে নাচ গান শোনায়।

রেড স্কোয়ার পাথর বাঁধানো বিরাট চৌকো এলাকা। ৬৯৫ মিটার লম্বা। ১৩০ মিটার চওড়া। সম্পুর্ণ এলাকাটি ৭০ হাজার বর্গ মিটার।

মস্কো দেখে বিখ্যাত বেলজিয়ন কবি এমিলি ভেরর্হারেন বলেছিলেন, সমস্ত শহরটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটা ওপেন

এয়ার মিউজিয়াম। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে ক্রেমলিন।

বাস্তবিকপক্ষে মস্কোর স্মারক চিহ্ন ক্রেমলিন। যে কোন প্রতিনিধিত্ব মূলক ছবি দেখাতে হলে দেখবেন ক্রেমলিনের টাওয়ার আর গ্রীক অরথোডকস চারচের চূড়া। মস্কো নদীর উপরে ২৮ হেক্টর জমি নিয়ে প্রাচীর ঘেরা এক প্রাসাদ নগরীর নাম ক্রেমলিন। ক্রেমলিনের একদিকে মস্কো নদী, আর একদিকে আর একটি ছোটখাল পরিখার মত ঘিরে রয়েছে। সেই খালের উপর সেতু দিয়ে ক্রেমলিনে প্রবেশের তোরণ দ্বার কুতাফায় টাওয়ারে পৌঁছতে হয়। প্রবেশ পথে পড়ে ছ-তলা সমান উঁচু ট্রিনিটি টাওয়ার। জারের বিজয়ী সেনারা এই পথ দিয়ে ঢুকতেন। ১৯১৮ সালের মারচ মাসে লেনিন ক্রেমলিনে ঢুকেছিলেন। তিনি তখন কাউন্সিল অব পিপলস কমিশনারের চেয়ারম্যান।

ক্রেমলিন কয়েক শতাব্দীর পুরাতন দুর্গ। ১১ শতকেও ক্রেমলিনের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১১৫৬ সালে ইউরি ডলগোরুকি বোরোভিটসকি পাহাড়ের ওপর একটি কাঠের দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন। এই দুর্গ পরবর্তীকালে ছিল মস্কোর রাজপুত্র আপানেজের বাসস্থান। ১২৩৮ সালে তাতার আক্রমণের সময় কাঠের কেল্লা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ১৩২৬-৩৯ সালে ওক গাছের গুঁড়ি দিয়ে ক্রেমলিনের দেওয়াল তৈরি হয়। তৈরি হয় দুটি পাথরের ক্যাথিড্রেল। ক্রেমলিন পরিণত হয় মসকোর গ্র্যানড প্রিনসেসের আবাস গৃহ হিসাবে। ১৯৪৫ সালে তাতাররা ক্রেমলিনের দুর্গদ্বার চূর্ণ করে দিয়ে ভেতরে ঢোকে। তারা ভেঙে চুরমার করে ফেলে দুর্গ, ধূলিসাৎ করে গীর্জা, পুড়িয়ে দেয় বাড়িঘর, ক্রেমলিনের অর্ধেক মানুষ তাদের হাতে নিহত হয়। তাতার আক্রমণের পর আবার সব কিছু নতুন করে তৈরি হয়েছে ক্রেমলিনের।

১৭৮৫-৯৫ সালের মধ্যে রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন আইভ্যান থি.।

ক্রেমলিনের চারিদিকে সাদা পাথরের প্রাচীর ভেঙে নতুন করে ইটের প্রাচীর আর টাওয়ার তৈরি করেন তিনি। এই প্রাচীর বার বার মেরামত হয়েছে। রাশিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আনা হয়েছে কুশলী মিস্ত্রিদের পুরনো ক্যাথিড্রালের বদলে তারা নতুন ক্যাথিড্রাল করেছে।

১৭১১ সালে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে স্থানান্তরিত হয় সেনট পিটারসবারগে (এখন যার নাম লেনিন গ্রাড)। ক্রেমলিন রাজবাড়ির মর্যাদা হারায়। পরিণত হয় জারের অস্থায়ী দরবার হলে। এখানে রাশিয়ান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের অভিষেক হত। ক্রেমলিনের মন্দিরে তাঁরা পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তারপর ১৭ ৭ সালে এল সর্বনাশা আগুন। ক্রেমলিনের সমস্ত কাঠের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে ক্রেমলিনের উপর আবার আঘাত আসে।

১৮১২ সালে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনা এসে ঢোকে ক্রেমলিনে। ফরাসীরা আসবার খবর পেয়ে ক্রেমলিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। ফরাসীরা এসে ঢোকে শূন্য পুরীতে। একমাসের ওপর নেপোলিয়নের সৈন্যরা ছিল ক্রেমলিনে। এরপর যখন প্রত্যাঘাত এল দেশপ্রেমিক রুশ সৈন্যদের কাছ থেকে, নেপোলিয়ন ক্রেমলিন ছাড়তে বাধ্য হলেন। কিন্তু যাবার আগে আদেশ দিলেন গোটা ক্রেমলিন জ্বালিয়ে দিতে, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মস্কো বাসী আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু তিনটি টাওয়ার, আইভ্যানের বিরাট ঘণ্টা ফটকটি ধ্বংস হয়ে যায়। নিকলোসকায়া টাওয়ারটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধের পর আবার সব কিছুর পুনর্নির্মাণ হয়।

বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে আবার রাজধানী চলে আসে মস্কোতে। ক্রেমলিন হয় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রশাসন কেন্দ্র।

তবু আজকের এই আধুনিক ক্রেমলিনের পুনর্গঠন হতে অনেক

দেরী হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের আগে ক্রেমলিনের পুনর্নির্মাণ শুরু হতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ক্রেমালিন। যুদ্ধের পর আবার সব কিছুর পুনর্নির্মাণও শুরু হয়। টাওয়ারের চূড়াগুলিতে নতুন করে টালি বসানো হল। শিট কপার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল সেগুলি। দূর থেকে মনে হয় যেন স্বর্ণ শিখর। দেওয়ালে দেওয়া হল ড্যামপ প্রুফ কোটিন। ১৯৫৫ সালের মধ্যে সমস্ত পুরনো ক্যাথিড্রাল ও প্রাসাদের আগেকার চেহারা আবার ফিরিয়ে আনা হল। ১৯৭৪সালে পুর্নর্নির্মিত হল রেড স্কোয়ারের সামনের টাওয়ারটি।

আমাদের গাইড দ্রুতগতিতে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্রেমলিন দেখাতে। এই দেখুন বিখ্যাত সোভিয়েত স্থপতি মিখাইল পুশোখিন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি প্যালেশ অব কংগ্রেস। উরাল পর্বতেব মারবেল কাঁচ আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। মাটির নিচে ১৫ মিটার রয়েছে। ·টি এসকেলেটর দিয়ে ৫ তলা এই বাড়ির যেখানে খুশী উঠে যান। ট্রইটসকায়া টাওয়ারকে বাঁদিকে ফেলে আসুন দোতলা বাড়ির দিকে· এটি এক সময়ের অস্ত্রাগার। ৩০ মিটার উঁচু। ১৭০২ সালে পিটার দি গ্রেটের সময় কাজ শুরু হয়। ১৭৩০ সালে শেষ হয়, অস্ত্রাগারে রয়েছে সারি সারি বন্দুক ও কামান। গুণে দেখবেন কামান আছে ৮৭৫টি। এগুলো সব নেপোলিয়নের সৈন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। ঢোকার মুখে ফলকে অনেক নাম। ১৯১৭ সালের ২৮ অকটোবর বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ক্রেমলিন অস্ত্রাগারের কিছু সৈন্যকে গুলি করে মারা হয়। অন্যদিকে ৯২ জন গ্যারিসন সৈন্যের নাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমারু বিমানের হানায় তাঁরা মারা যান।

লেনিন ১৯১৮ সালের মারচ মাসে ক্রেমলিনে ঢুকেছিলেন, ওখানেই তিন তলা বাড়িতে তিনি থাকতেন। ১৯২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত ক্রেমলিন ছিল লেনিনের ঠিকানা, ওই বাড়িটিতে জারের আমলে সেনেটের অধিবেশন বসত। লেলিনের বিপ্লবোত্তর রাশিয়া গৃহযুদ্ধে

দীর্ণ, সেদিন লেলিন এই বাড়িতে বসে সমগ্র রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর পুনগঠনের কাজ চালাচ্ছেন, গৃহযুদ্ধের মোকাবেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। ওই বাড়ির তিনতলাটা নিয়ে ছিল লেলিনের স্টাডি। ছিমছাম ঘর, একটি ছোট লেখার টেবিল, এই স্টাডি রুমে বসে লেনিন অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর স্টাডি রুম থেকে পাসেজ চলে গেছে হলে। সেখানে যে আরম চেয়ারে লেনিন বসতেন সেটি এখনও রয়েছে। এখন হলটি একটি মিউজিয়ম।

সেনেট হল ও প্যালেশ অব কংগ্রেসের বিপরীতে পাঁচ গম্বুজ ওয়ালা একটি চারচ—নাম দ্বাদশ অবতার গীর্জা চার্চ অব টুয়েল্ভ অ্যাপস্টলস। সামনে পাটরিয়ারকস প্যালেশ, ১’৩৫—৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখন চারচ ও প্যালেশ দুটোই যাদুঘর। এর মধ্যেই আছে প্রাচীন পুঁথিপত্র, জুয়েলারি অ্যানটিক সব মিলিয়ে ৭০০ এগজিবিট। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘণ্টাটি যেমন আছে ক্রেমলিনে তেমনি সবচেয়ে বড় কামানটিও আছে এখানে, ষোড়শ শতকের এই কামানটির ব্যাস ৮৯০ মিলিমিটার ১৫৮ সালে ৫৩' মিটার দীর্ঘ ও ৪০ টন ওজনের এই ব্রোঞ্জের কামানটি তৈরি করেন আনদ্রেই চোকভ। তবে এই কামানটি থেকে কখনও গোলাদাগা হয়নি তা শুধু দর্শনধারী।

ক্রেমলিনের ভেতর একটি উঁচু জায়গার নাম ক্রেমলিন হিল যেখানে রয়েছে লেনিনের এক মূর্তি। ১৯১৯ সালে এখানে দুই শনিবার লেনিন মিলিটারি ট্রেনিদের সঙ্গে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে কাজ করেছিলেন। কাজের অবসরে লেনিন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। ঠিক সেই ভঙ্গিমায় করা হয়েছে স্ট্যাচুটি। স্থপতি ভ্লাদমির পিনচুক ও সেরগেই স্পেরানসকির অক্ষয় ভাস্কর্য কীর্তি। ১৯৬৭ সালের ২রা নভেম্বর স্ট্যাচুটি উন্মোচিত হয়। সেটা অকটোবর বিপ্লবের ৫০ বছর। এই ক্রেমলিন হিলের ওপর থেকে তাকিয়েছিলাম সূর্যালোকিত উদ্যান নগরী মস্কোর দিকে। দূরে দেখা যায় ১৭৩ মিটার উঁচু রসিয়া হোটেলের উদ্ধত চূড়া। কোটেনিনি চেসকায় এমব্যাঙ্কমেনটে ৩৭১

মিটার উঁচু অ্যাপারটমেনট বাড়ির জানলাগুলি সূর্য কিরণে ঝলমল করে। মস্কো নদীর ওপরে ভেসে চলে প্রমোদ তরণী। শহরের মাঝখান দিয়ে বহতা নদী সে তো প্রকৃতির অকৃপণ দান। ইউরোপের বহু শহর পেয়েছে এই অনুপম সৌভাগ্য। টেমসের ওপর লণ্ডন, সেইনের ওপর প্যারিস, ডানিয়ুবের উপর বুদাপেসত, মস্কো নদীর উপর মস্কো শহর, নীল নদের উপর কায়রো, আমাদের কলকাতাতেও ছিল পতি-তোদ্ধারিনী গঙ্গা। শহরের মাঝখান দিয়ে ছিল নাব্য খাল। এই শহর হতে পারত আর এক লণ্ডন। এই শহরের খাল যা আজ ঘোলা জলের ডোবা তা হতে পারত প্রমোদ তরণী ভাসাবার স্বচ্ছ সরোবর। কিন্তু সবাঙ্গে ক্ষত নিয়ে আমরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি এখনও। তার মাঝে সত্যিকারের বিপ্লব করে অন্য দেশ এগিয়ে যায়। মস্কোর সেই বিখ্যাত ঘণ্টাটি দেখলাম ক্রেমলিনে। ২০০ টন ওজন। ৬'১৪ মিটার উঁচু। ৬০৬ মিটার ব্যাস। ১৭৩১ সালে এক বিধবংসী অগ্নিকাণ্ডে ঘণ্টাটির একটি অংশ বিচ্যুত হয়ে যায়। সেই বিচ্যুত অংশটিরই ওজন ১১৫ টন। ১৭৩৩-৩৫ সালে আইভ্যান ম্যাটোরিন ও তাঁর ছেলে মিখাইলের সময় এটি কাসটিং হয়। কাসটিং পিটে ঘণ্টাটি পড়ে ছিল ১০০ বছর, ক্রেমলিনের ভেতর বিভিন্ন ক্যাথিড্রাল ছাড়া আর যে দর্শনীয় বাড়িটি রয়েছে সেটি ক্রেমলিন প্যালেশ, (১৮৪৮-৪৯) সালের মধ্যে কনস্ট্যানটিন থন ২৫ মিটার দীর্ঘ এই প্যালেশ তৈরি করেন। উচ্চতায় প্রাসাদটি তিনতলা। এই বাড়িতেই বাস করতেন জার পরিবার।

প্রাসাদে অনেকগুলি বড় হল আছে, তার মধ্যে জরজাইভসকি হলটি ৬১ মিটার দীর্ঘ ও ২০৫ মিটার চওড়া ও ১৭'৫ মিটার উঁচু। তিনহাজার বৈদ্যুতিক আলোয় হলটি রাতে ঝলমল করে। এই হলে এখন রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা হয়। ১৯৪৫ সালে নাজি জার্মানীর পরাজয়ের পর বিজয় অনুষ্ঠান হয়েছিল এখানেই। ১৯৪৫ সালে ইউরি গ্যাগরিন গোলড স্টার পেয়েছিলেন যা এক দুর্লভ রাষ্ট্রীয় সম্মান। মস্কোর স্কুলের

ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতি বছর হয় উইনটার পারটি। এই জরজাই-ভসকি হলের লাগোয়া ভ্লাদিমিরিসকি হল। এই হল দিয়ে যাওয়া যায় পাশের টেরেম প্যালেশে। সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত রুশ স্থপতি লারিয়ন উশাকভের তৈরি এই প্রাসাদে রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর তৈলচিত্র। থ্রোন রুম হল ১৭ শতকের জারের স্টাডি রুম। এই ঘরের মাঝখানে জানালার নিচে একটি বকস আছে। সেখানে প্রজারা তাদের আবেদন রেখে যেত। এজন্য ওই জানালাটির নাম আবেদন জানালা। গ্র্যানড প্যালেশের সবচেয়ে বড় হলে তিনহাজার লোক বসতে পারে। এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন হয়।

রাজ প্রাসাদের নিচের তলায় প্রধান প্রবেশ পথের বাঁদিকে রয়েছে কতকগুলি স্যুট। এখানে থাকতেন রাজপরিবারের লোকজনেরা। এখানে প্রত্যেকটি ঘর মারবেল দিয়ে বাঁধানো, সেই সঙ্গে রয়েছে মুরালের কাজ। ঘরে নানা ধরণের স্ট্যাচু সাজানো।

ক্রেমলিন সম্পর্কে একজন বেলজিয়ান কবি বলেছিলেন, গোটা মস্কো শহরটাইতো একটা মিউজিয়ম, তবে সবচেয়ে সাজানো গোছানো আর আকর্ষণীয় মিউজিয়মটির নাম ক্রেমলিন, কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্যি।

মস্কোতে এসে তিনটি জিনিষ সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে। বাড়ি-গাড়ি আর ঘড়ি। বাড়ি অর্থে সর্বত্র স্কাই স্ক্র্যাপার।

প্রতিটি বাড়ির সামনে সবুজ বাগান লন। বাড়িগুলিকে সেজন্য ভারটিক্যাল বস্তি বলে কদাচ মনে হয় না। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক যোজনায় সোভিয়েত ইউনিয়নে ১১,৩৫০,০০০ নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হয়েছে। ১৯৫০ সালের মধ্যে গৃহনির্মাণ খাতে
লগ্নীর পরিমাণ ৬০ হাজার মিলিয়ন রুবল।

প্রতিবছর ১ লক্ষ ২০ হাজার করে নতুন ফ্লাট জনসাধারণের মধ্যে

বিতরন করা হচ্ছে মস্কো শহরে দিনে ৩০০ করে ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। শহরের শতকরা ৯৪টি বাড়িই বহুতল। প্রত্যেকটি বাড়িতে সরকার থেকে জলের দামে ইলেকট্রিক স্টোভ সরবরবাহ করা হয়। প্রতি কিলোয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য খরচ পড়ে মাত্র দু কোপেক। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রত্যেক নাগরিককে ৭০০ লিটার করে জল সরবরাহ করা হয়।

এই বাড়ির জন্য মস্কোবাসী একদা অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। যুদ্ধের সময় অধিকাংশ বাড়ি ভেঙ্গে চুরে যায়। দুকোটি লোকের মৃত্যু হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। তাই যুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় প্রচণ্ড গৃহ সংকট, এই গৃহ সংকটের জন্য মা বাবা, ছেলে ছেলের বউ, অবিবাহিত বোনকে এক কামরা বা দু কামরার ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হত। একান্নবর্তী পরিবার এইভাবে টি'কে ছিল অনেকদিন। ছেলেমেয়েরা বয়সকালে বিয়ে করতে পারতনা। দু কামরার ফ্ল্যাটগুলিতে দুই পরিবার একসঙ্গে থাকতেন ভাগাভাগি করে।

এখনও কিছু কিছু এমন ফ্ল্যাট রয়েছে সেটিতে দুই পরিবার শেয়ার করে থাকেন। দ্বিতীয়বার মস্কো গিয়ে আমাদের সাংবাদিক বন্ধু হিতাংশু দাশগুপ্তের বান্ধবী ও বর্তমানে পত্নী তানিয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে ছিলাম। মস্কোর উপকণ্ঠে যে ফ্ল্যাটটিতে তানিয়া থাকতেন সেই ফ্ল্যাটেই এক বুড়োবুড়ি থাকতেন আর একদিকের ঘরে, কমন লাউঞ্জ। কমন বাথরুম, এমনকি রান্নাঘরের একপ্রান্তে তানিয়া রাঁধে অন্যপ্রান্তে আর এক পরিবার। বাথরুমে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। পাশাপাশি ঝুলছে দুই ভাড়াটিয়ার দুই তোয়ালে। পাশে রাখা টুথব্রাশ, সাবান ও সুন্দর ভাবে রাখা আছে আলাদা করে। এখনতো আমরা বিয়ের পর মা বাবার সঙ্গেই একসঙ্গে থাকতে চাইনা। ওখানে দুটি ভিন্ন পরিবার এক পরিবারের মত কি সুন্দর একাত্ম হয়ে বাস করছে। এই প্রচণ্ড সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রশংসা করার মত।

কর্তৃপক্ষ বলছেন : যে রেটে বাড়ি উঠছে তাতে করে আগামী দশবছরের মধ্যে গৃহ সমস্যা থাকবে না। এখন কেউ এমন নেই যাকে বলা যায় গৃহহীন। আমাদের দেশের মত ফুটপাথে ঘর সংসার বাঁধার কথা চিন্তা করা যায় না ওদেশে। সমাজতন্ত্র যা দিয়েছে তাতে করে কোন লোকের গৃহহীন হয়ে রাস্তায় বা বস্তিতে কাটাবার উপায় নেই। পশ্চিমী দেশগুলির মত সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন বস্তি নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অধিকাংশ বাড়িই প্রিফ্যাবরিকেটেড। আমাদের মত ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে তৈরি নয়। বড় বড় প্যানেল, ব্লক, স্ল্যাব তৈরি হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাইটেই। তারপর সেগুলি বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যবহৃত হচ্ছে সিনথেটিক বেসিনস, গ্ল্যাস ফাইবার, সিরামিক টাইলস, গ্লাস মোজাইক।

পুরনো মস্কোকে ভেঙে চুরে শহরের সংলগ্ন অনেকগুলি উপনগরী তৈরি হয়েছে। এর ফলে শহরের কেন্দ্র থেকে জনসংখ্যার চাপ কমেছে। পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে সেসব জায়গায় নতুন বাড়ি তোলা হয়েছে। শহরের লে আউট সম্পুর্ণ ভাবে বদলে গেছে। আজ মস্কো শহরকে দেখলে ঝকঝকে এক নতুন শহর বলেই মনে হবে। পুরনো শহরকে একেবারে ঢেলে সাজানো হয়েছে এইভাবে। এক একটি উপকণ্ঠ বা নেবারহুড গড়ে উঠেছে দশ থেকে পনের হাজার জনসংখ্যা নিয়ে। প্রতেকটি উপকণ্ঠে রয়েছে ফুল বাগান, বিনোদন কেন্দ্র, বাচ্চাদের খেলার জায়গা। দোকান, কাফে, রেস্তারা ক্রেশ, পলিক্লিনিক, কিনডার গারটেন, স্কুল, লণ্ড্রি, লাইব্রেরী, ক্লাব, সিনেমা। প্রত্যেকটি এলাকার সঙ্গে মস্কো শহরের দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে উপনগরীগুলি যে সফল হয় না, তার কারণ সেনট্রাল ডিসট্রিকট বা শহরের কেন্দ্র থেকে উপনগরীগুলির দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। কলকাতায় এত বছর পরে যে পাতাল রেল গড়ে তোলা হচ্ছে তা সম্পুর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভাবে। সবার আগে দরকার ছিল পাতিপুকুর, লবণ হ্রদ, দমদম পার্ক, বাগুইহাটি, দক্ষিণে গড়িয়া, নরেন্দ্র-

পুর প্রভৃতি এলাকার সঙ্গে চৌরঙ্গী, হাওড়া, শিয়ালদার দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা—তা সে পাতাল রেলই হোক বা সারকুলার রেলই হোক। দ্বিতীয়ত রেল স্টেশন ও এয়ারপোরটের সঙ্গে ডাউন টাউনের ব্যাপক আউটলেট তৈরি করা আধুনিক নগর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এজন্য দরকার একাধিক ফ্লাই ওভার।

স্বাধীনতার পর শহর কলকাতার নগর পরিকল্পনায় আমরা কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। এমনকি যেসব পাবলিক বিলডিং তৈরি হয়েছে তার অধিকাংশেরই স্থাপত্যও তারিফ করার মত নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সব নতুন নতুন পাবলিক বিলডিং হয়েছে সেগুলির স্থাপত্য কীর্তিও তাকিয়ে থাকার মত। ১৯৫০ সালে ২১তম কংগ্রেস হয় সি পি এস ইউর। সেই উপলক্ষে ক্রেমলিনের ভিতর তৈরি হয়েছিল প্যালেশ অব কংগ্রেস। আগেই বলেছি তার কথা। ছ হাজার দর্শক বসতে পারেন ওই হলে, অ্যাকোয়াসটিক সম্পূর্ণ আধুনিক। পাঁচহাজার আলো জ্বলে। অভ্যাগতদের জন্য ২৫০০ লোকের এক ব্যাঙ্কোয়েট হল তৈরি হয়েছে কংগ্রেস হলের সঙ্গে। এ ছাড়াও এই প্যালেসে রয়েছে আরও ৮০০ ঘর। প্রেসিডিয়াম, কূটনৈতিক অফিসারদের নানা বৈঠকের জন্য। এই কংগ্রেস হলে নানা ধরণের অনুষ্ঠান লেগেই আছে। তাছাড়া প্রায়ই গান বাজনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আমাকে ওই কংগ্রেস হলে ইউনি দেখতে নিয়ে গিয়েছিল এক লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান।

মস্কোর নতুন নতুন বাড়ির মধ্যে ইউক্রাইনা হোটেলের সামনে মস্কো নদীর তীরে কাউনসিল ফর মিউচ্যুয়াল ইকনমিক অ্যাসিসট্যানসের ৩২ তলা বাড়িটি দেখার মত। বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও পূর্ব জার্মানী এই বাড়ি তৈরি করার কাজে সহযোগিতা করে।

কালিনিন এভিনিউতে দর্শনীয় বাড়ির মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন প্রশাসনিক ও ক্যাম্পিং সেণ্টার। তার আগে দুপাশে চারটি ২৬ তল

বাড়ি—এগুলি সবই সরকারী অফিস। ওইখানে ওকটাইবার সিনেমা হাউস ও একটি বইএর দোকান। সিনেমা হাউসের আসন সংখ্যা তিন হাজার।

অন্যান্য দর্শনীয় বাড়ির মধ্যে আছে কুতুজভ এভিনিউতে রোসিয়া সিনেমা প্যালেশ, লেনিন হিল এ ইয়ং পায়োনিয়র প্যালেশ, জারিয়া ডাইতে বিশাল রাশিয়া হোটেল যেখানে ছ হাজার শয্যা আছে। ভেরালভেসকি এভিনিউতে তৈরি হয়েছে একটি সারকাস—যার স্থাপত্য রীতিটিও সুন্দর।

ওসটানকিনোতে ৫৩৭৫ মিটার টিভি টাওয়ারটিও মস্কোর নতুন দর্শনীয় স্থানের তালিকার মধ্যে পড়ে। এই টিভি টাওয়ারের উপরের রিভলবিং রেস্তারায় বসে আমরা একদিন দুপুরের লাঞ্চ সেরেছিলাম। দ্রুতগামী লিফটে দুমিনিটের মধ্যেই ওই বিরাট উঁচু টাওয়ারে ওঠা যায়। সেখান থেকে বৈমানিকের দৃষ্টিতে গোটা মস্কো শহরকে দেখুন ও রুশ খাদ্য সহযোগে ভদকা পান করুন।

আধুনিক মস্কো যে একটি বিরাট সাজানো বাগানের মত তার একটা বড় কারণ শহরের তিন ভাগের এক ভাগ জুড়েই আছে সবুজের সমারোহ।

সারা শহরে ৩০০০০ হেকটর গাছ রোপণ করা হয়েছে, এই গাছের আড়ালে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ যে বাস করছেন তা বোঝাই যায় না। এখন যত এলাকায় গাছ মস্কোর আয়তন ঠিক ওই পরিমাণ ছিল এক সময়। এলাকা বাড়তে বাড়তে এখন ৮৮৬০ হেকটর হয়েছে। এখন মসকোর আয়তন নিউইয়রকের চেয়ে বড়। প্যারিসের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ। শহরে ষ্ট্রিটের সংখ্যা ১৬১৩। এভিনিউ ৩৬টি ও ৮৬৬টি লেন।

কিন্তু কোন শহরের প্রাণ ও জীবনী শক্তির পরিচয় তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। মস্কোর বলশাই, ডাকটানগভ, মসকো ভাইট থিয়েটার তো বিশ্ববিখ্যাত মস্কো শহরে রয়েছে ১২৩টি সিনেমা হল। মস্কোবাসীর সিনেমাপ্রীতি ও পুস্তকপ্রীতি সর্বজন বিদিত।

একজন মস্কোবাসী বছরে ১৭টি করে সিনেমা দেখেন। মস্কো শহর থেকে প্রকাশিত হয় ৩৪টি কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র, ৩২০০ সাময়িকপত্র। ৩৪টি সংবাদপত্রের প্রচার ২০ কোটি ও ৩২০০ সাময়িকপত্রের প্রচার ২১ কোটি। মস্কো শহরে ১১ হাজার মানুষ সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। মস্কোর লোকেরা ৮০ লক্ষ কপি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের গ্রাহক। এ ছাড়া নিউজ স্ট্যানড থেকে প্রতিদিন ৪০ লক্ষ করে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন বিক্রি হয়।

মস্কো থেকে যে কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি আরও ৪৫টি শহর থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৭০টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র প্রকাশ করে। এক লক্ষ দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয় মস্কোর বিভিন্ন এলাকায়।

এক কথায় বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কোনো পরিসামা রাখা হয়নি। মস্কো শহরে শতকরা ৯৪টি পরিবারের টিভি আছে। বই প্রকাশনা ক্ষেত্রে মস্কো পৃথিবীর বৃহত্তম পুস্তক প্রকাশনা কেন্দ্র। ৭১টি প্রকাশক সংস্থা আছে মস্কোতে। বিপ্লবের আগে থেকেই মস্কোতে সারস্বত চর্চার ঐতিহ্য ছিল। ১৯১৩ সালেও বছরে ছ'হাজার টাইটেল ছাপা হত। ১৯৫০ সালে ৪৫ হাজার বই ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে মস্কোতে যার মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি কপি। মস্কোতে বছরে বই এর বিক্রি অবিশ্বাস্য—নয় কোটি। এই বোধ হয় বিশ্বের একমাত্র শহর যেখানে গোটা জনসংখ্যার অর্ধেকই কোন না কোন গ্রন্থাগারের সদস্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাবলিক লাইব্রেরী লেনিন লাইব্রেরী দেখতে গিয়েছিলাম, বাংলা বই এর একটি বিরাট শাখা সেখানে রয়েছে। ২১টি হল আছে পাঠকদের বসে পড়বার জন্য। বছরে ২২ লক্ষ মানুষ গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেন। বই এর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি।

মস্কোবাসীর বই প্রীতির একটি উদাহরণ দিই। আমার সাম্প্রকিতম

মস্কো সফরে ল্যাংকিনের সঙ্গে ঘুরছি পায়ে হেঁটে। পথের ধারে দেখি বিরাট কিউ।

কী ব্যাপার?

ল্যাংকিন জিজ্ঞাশা করল একজনকে।

জানা গেল, আজ একটি জনপ্রিয় লেখকের বই প্রকাশিত হয়েছে। এক কপি কেনবার জন্য এই লাইন।

কলকাতায় পথ হাঁটা যেমন যন্ত্রণা, মস্কোতে পথ চলা তেমনি আরাম দায়ক। এক এক সময় আমার মনে হত এই যে গাড়ি করে দ্রুত চলাফেরা করছি তার ফলে বঞ্চিত হতে হচ্ছে পায়ে হাঁটার আনন্দ থেকে। কবির ভাষায় পথে চলায় সেই তো তোমায় পাওয়া।

আমার সহকর্মী সুদেব বলতো, হাঁটো হাঁটো কোনদিন খোঁড়া হয়ে যাবে, হাঁটবার সুযোগ পাবে না। সুদেবের কথার মাহাত্ম্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হলে মস্কোব পথে পথে ঘুরতে হয়। মস্কো শহরে রাস্তা যতখানি চওড়া ফুটপাথ ঠিক ততখানি। মসৃণ কংক্রীটের প্রশস্ত ফুটপাথ। কোথাও এক ফোটা ধূলো জমে নেই। ফুটপাথের মাঝে কোথাও সারি সারি গাছ। কোথাও ফোটা ফুলের মালা। পথশ্রমে ক্লান্ত হলে পথের মোড়ে মোড়ে পানায় জলের কল ও একটি করে কাঁচের গ্লাশ। পথের ধারে ধারে কিয়সক। সেখানে পাওয়া যায় খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, টফি, চুইংগাম, সুভেনির আরও টুকিটাকি মনোহর জিনিস। হাতে মস্কোর একটি ম্যাপ নিয়ে আমিও একা একা হাঁটতে বেরিয়েছি। মস্কোর প্রধান রাজপথ গোরকি স্ট্রিট। লণ্ডনের রিজেনট স্ট্রিটকিংবা দিল্লির বড়াখাম্বা রোডের মত ডাউন টাউন থেকে বেরিয়েছে। গোরকি স্ট্রিট ধরে গেলে আপনি একেবারে লেনিনগ্রাডে গিয়ে পৌছবেন। এক সময় গোরকি স্ট্রিটই ছিল মস্কোর প্রধান রাস্তা। পুরো রাস্তাটা পায়ে হেঁটে দেখতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। ১৯৩৫ সালে রাস্তাটি ১৯ মিটার থেকে ৫৬ মিটার চওড়া করা হয়। এজন্য দু'পাশের বহু পুরনো বাড়ি ভাঙতে হয়েছে।

বেলোরুশকায় মেটরো স্টেশন গোর্কি স্ট্রিটের ঠিক মুখে। একটু দূরে বাইলো রাশিয়া রেল স্টেশন। ওয়ারশ ও বার্লিন যেতে হলে এখানে ট্রেন বদল করুন। প্যারিস, ভিয়েনা, লণ্ডন, ওসলো, ও স্টক হলমে যেতে চান তাহলে এই স্টেশনে আসুন। স্টেশনটি তৈরি হয়েছিল ১৯০৯ সালে। সবে মেরামত শুরু হয়েছে।

গোরকি স্ট্রিটের বিশাল পারকটি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এখানে অনেক সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে এখন যুদ্ধবিজয়ীরা ফিরে এলেন তখন এখানেই নাগরিকেরা তাঁদের জানিয়েছিলেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। স্কোয়ারের ঠিক মাঝখানে একটি ছোট্ট বাগানে রয়েছে ম্যাকসিম গোরকির মর্মর মূর্তি। ১৯৫১ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

বাইলোরাশিয়া স্টেশনের বাঁদিক ঘেঁষে চলে গেছে লেনিনগ্রাড প্রসপেকট। গোরকি স্ট্রিট থেকে লেনিনগ্রাডের দূরত্ব ৭২৫ কিলো-মিটার। এই প্রসপেকট দিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয়। এই রাস্তাটি তু পাশে সবুজ গাছে ঘেরা। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য শুধু সৌন্দর্য নয়। রাস্তার তু পাশে খেলা-ধূলার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। বাইলোরাশিয়া স্টেশনে যাবার জন্য যে ভায়াডাকট চলে গেছে তার ডান দিকেই পড়বে মস্কো ঘড়ির কারখানা। কিছু দূরে (তু রাস্তা পরে) সোভেটসকায়া হোটেল। আরও কিছু দূরে বেগোভায়া স্ট্রিট ধরে এগুলে পড়বে মস্কো রেস-কোরস। বাইলোরাশিয়া স্টেশনের কাছেই প্রাভদা স্ট্রিট যেখানে বিখ্যাত প্রাভদা পত্রিকার অফিস। এই পত্রিকার প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আরও এগুলে পড়বে ইয়ং পায়োনিয়ারস স্টেডিয়াম। মস্কো সাইকেল ট্র্যাক।

খেলাধুলার বিরাট ও বিচিত্র সুযোগ সুবিধা আছে প্রতিটি সোভিয়েত শহরে। তার মধ্যে মসকো প্রধান। ১৯৭৮ সালে প্রথম

মস্কো দর্শনের সময় ১৯৫০ সালের মস্কো ওলিমপিকের প্রস্তুতি চলছে। দিনরাত তৈরি হচ্ছে স্টেডিয়াম, ফ্ল্যাট।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেকটি স্কুলে ছেলেমেয়েদের পিটি করা আবশ্যিক। ১৩০টা স্পোরটস স্কুল আছে সে দেশে। ছোটবেলা থেকেই সেখানে ভরতি হওয়া যায়। তবে পড়াশোনায় ভাল না হলে স্পোরটস স্কুলে ভরতি করা হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ছ হাজার কলকারখানার কর্মীরা প্রতিদিন কাজে যোগ দেবার আগে পিটি করে নেয়। আর মস্কো শহরের মত খেলাধূলার বিরাট ব্যবস্থা আর কোন শহরে আছে জানিনা।

৬০টি বড় স্টেডিয়াম আছে এই শহরে, ১৩৩৫টা জিমখানা, ২৫টি সুইমিংপুল, ৩৫০টি ফুটবল পিচ, ,০০০ ভলিবল ও বাসকেট বল কোর্ট, দুটি ভেলোড্রোম ও একটি রোইং চ্যানেল।

১৯৫০ সালের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওলিম্পিকে যোগ দেয়নি। তারপর মেলবোরণ, রোম, টোকিও, মেকসিকো, মিউনিখ, মনট্রিল ও মস্কোতে রাশিয়ান অ্যাথলেট ও খেলোয়াড়েরা যোগ দিয়েছে। প্রতিটি ওলিম্পিক থেকেই নিয়ে এসেছে সোনা, রূপো আর ব্রোঞ্জ।

১৯৫০ সালে আমি দেখতে গিয়েছিলাম ওলিম্পিকের প্রস্তুতি। ১৯৫০ সালে দেখলাম ওলিম্পিকের পর বিরাট স্টেডিয়ামগুলিতে খেলাধূলোর ট্র্যাডিশন রক্ষা করা হচ্ছে।

ওলিম্পিকের জন্য সেনট্রাল লেনিন স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে ১৮ হেকটর জমির ওপর। তৈরি হয়েছে ১০৪ মিটার × ৬৯ মিটার ফুটবল পিচ, ৪০০ মিটার দৌড়ের চার ট্র্যাক এরেনা।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রশংসনীয় কাজ হল জাতি গঠনের জন্য এবং মানসিক মুক্তি ও শরীর চর্চার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। চাই সুসংস্কৃত মন, ও বলদীপ্ত গঠন। শুধু কেতাবি শিক্ষা নয়, সেই সঙ্গে দরকার এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করা। তাই নাচ-গান-সাহিত্যসৃষ্টি, সারকাস, এই সমস্ত কর্মকাণ্ডকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পবিত্র কর্তব্য বলে

মনে করে। শিশুসাহিত্য যে আদৌ উপেক্ষার বস্তু নয় সেটাও এরা উপলব্ধি করেছে। গোরকি স্ট্রিটেই আছে হাউস অব চিলড্রেনস বুকস। এক বিরাট প্রাসাদ জুড়ে ছোটদের বই-এর দোকান। এখানে শিশুদের সঙ্গে তাঁদের প্রিয় লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আমার প্রথম ট্যুরে আমার গাইড ইউরি নিয়ে গিয়েছিল পিকিং হোটেলে ডিনার খাওয়াতে। গোরকি স্ট্রিট এসে পড়েছে মায়াকাভোসকি স্কোয়ারে। মায়াকোভোসকির স্ট্যাচুর ঠিক পিছনে হোটেল পিকিং এর বিশাল বাড়ি এক সময় যথেষ্ট রমরমা ছিল। এখনও চীনা খাবারের লোভে সন্ধ্যায় বহুলোক এসে ভিড় করেন এই হোটেলে।

মস্কোর আব দুটি নাম করা রাস্তার একটি হল মার্ক্স প্রসপেকট আর একটি কালিনিন প্রসপেকট। গোবকি স্ট্রিট এসে মিশেছে মার্ক্স প্রসপেকটে। আবার মার্ক্স প্রসপেকট এসে মিশেছে কালানিল প্রসপেকট। মার্ক্স প্রসপেকটের বিশাল অংশ জুড়ে অকটোবর রেভোলিউশনের ৫০তম জন্মবার্ষিকী স্কোয়ার।

মার্ক্স প্রসপেকটের উপর তৈরি সেনট্রাল লেনিন মিউজিয়ম। ৩৪টি হল জুড়ে ১২ হাজার এগজিবিট নিয়ে একটি মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর এত বড় একটি বিরাট সংগ্রহশালা বিশ্বের আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই, লেনিন মিউজিয়মের কাছেই ঐতিহাসিক মেটরোপোল হোটেল। ঐতিহাসিক বলছি এই কারণে যে ১৯১৭ সালে বিপ্লবীরা হোটেলটির দখল নেওয়ার জন্য তুমুল যুদ্ধ চালান। পাঁচতলা এই হোটেলটি তৈরি হয়েছিল ১৯০০ সালে জার আমলে। তারপর কয়েকবার পুনর্নির্মিত হয়েছে হোটেলটি। মেটরোপোল হোটেলের সামনে রয়েছে লেভ কেরবেলের তৈরি কার্ল মার্ক্সের বিখ্যাত স্ট্যাচুটি। লেনিন স্বয়ং যার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯২০ সালে। মার্ক্স প্রসপেকট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই বলসই থিয়েটার। জার আমলে রাশিয়ার রাজনৈতিক অবক্ষয়ের মাঝেও শিল্প-কলা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রমাণ উনিশ শতাব্দীর কালজয়ী রুশ সাহিত্যগুলি।

রাশিয়ার অনুপম ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে রাজ-প্রাসাদগুলি ও অসংখ্য মর্মর মূর্তির মাঝে।

স্ট্যাচু তৈরি বা ভাস্কর্য ইওরোপের শিল্প জীবনের আর একটি ঐতিহ্য। এমন কোন ইওরোপের শহর পাওয়া যাবে না যেখানে ভাস্কর্যকীর্তির পরম্পরা ছড়িয়ে নেই। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর শিল্পে আবার নবজোয়ার এসেছে। তৈরি হয়েছে অসংখ্য স্ট্যাচু। এমন কোন রাস্তা ও পার্ক নেই যেখানে স্ট্যাচু নেই। এইতো কার্ল মার্ক্স প্রসপেকট ঘুরলেই চোখে পড়বে প্রথম রুশ মুদ্রক আইভ্যান ফিয়োদ্রভের স্ট্যাচু। লেনিনের সহযোদ্ধা ফেনিকস জেরঝিলস্কির স্ট্যাচু জেরঝিলস্কির নামে একটি রাস্তাও রয়েছে এখানে।

আর শিবময় কাশীর মত মিউজিয়ম ময় মস্কো, এটিও ইওরোপের বৈশিষ্ট্য। ইওরোপের প্রাণভোমরা ধরা থাকে তার মিউজিয়মের মধ্যে। আমাদের মত মিউজিয়ম সেদেশে বিস্ময়ের যাদুঘর নয়, তা প্রাণবন্ত চলমান ইতিহাস। মস্কোতে আমি গুণেছি উল্লেখযোগ্য মিউ-জিয়মের সংখ্যা তেত্রিশটির মত। বিপ্লবের ইতিহাস নিয়েই তৈরি হয়েছে চারটি মিউজিয়ম। ইতিহাসের উপর গোটা পাঁচেক মিউজিয়ম। আর্ট মিউজিয়ম গোটা সাতেক। সাহিত্যের উপর মিউজিয়ম আটটি, গোরকি, টলস্টয়, পুশকিন, চেখভ, ডস্টয়স্কি, মায়াকোভস্কি, অসট্রো-ভস্কিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মিউজিয়ম, থিয়েটার ও মিউজিককে নিয়ে গড়ে উঠেছে মিউজিয়ম। থিয়েটার কনসারট হল ও সারকাসের সংখ্যা ৪০টির মত। এর মধ্যে শিশুদের জন্য থিয়েটার আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ঐতিহ্যশালা থিয়েটার বলশই। কার্ল মার্ক্স প্রসপেক্ট থেকে একটু এগুলেই ভেরদলভ স্কোয়ারকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত বলা হত থিয়েটার স্কোয়ার। উনিশ শতকের গোড়ায় এখানে দুটি থিয়েটার তৈরি হয়। এই দুটি থিয়েটারের একটি ছিল অপেরা ও ব্যালের জন্য। আর একটি নাটকের জন্য। এই দুটি থিয়েটারের একটিকে বলা হত বলশই অর্থাৎ বড আর একটি ম্যানি অর্থাৎ ছোট।

বলশই থিয়েটারের বাড়িটিই এক বিরাট স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন। সামনে ধাবমান অশ্বের রাশ ধরে রথ বসে রয়েছেন শিল্পদেব অ্যাপলো। অলেকজাণ্ডার মিখাইলভ ও ওসিপ বোভাইস ১৮২৪ সালে তৈরি করেন এই থিয়েটারটি, ১৮৫৬ সালে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায় এই বাড়িটি। তারপর নতুন করে তৈরি হয়। ১৯৪১ সালের অকটোবরে নাজি বোমায় বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেই আবার বাড়িটি পুনর্নির্মিত হয়। একদিকে চলছে যুদ্ধ, আর একদিকে পুনঃনির্মাণ চলছে নাট্যশালায়।

বছরের পর বছর ধরে বলশই থিয়েটার রুশ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। মিখাইল গ্লিঙ্কা কমপোজ করেছেন আইভ্যান সুসানিন ও রুশনান ও লুডমিলা, চাইকোভসকির (১৮৪০-৯৩) সোয়ান সঙ, ইউগেনে ওনেগিন ও কুইন অব স্পেডস মুসোরগস্কির (১৮৩৯-৮২) বরিস গডুনভ, বোরোদিনের (১৮৩৩-৮৭) প্রিনস ইগোর রিমসকি কোরাসকভের (১৮৪৪-১৯০৮) বিভিন্ন অপেরা।

বলশই থিয়েটার যে সব ব্যালে ও অপেরা করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তার মধ্যে আছে রোমিও জুলিয়েট, ওয়ার অ্যানড পিস, আইভ্যান দি টেরিবল, ডিসেমব্রিসটস. স্পারটাকাস, অ্যানাকারনিনা, ডেড সোলস।

অনেকেই জানেনা এই বলশই থিয়েটার হলেই বহু রাজনৈতিক সম্মেলন হয়।

১৯১৮ সালে অল রাশিয়ার কংগ্রেস অব সোভিয়েতসের অধিবেশন হয় এখানে। গৃহীত হয় রাশিয়ার সংবিধান। ১৯২০ সালে অল রাশিয়া কংগ্রেস অব সোভিয়েতসের সম্মেলনে রাশিয়ার জন্য লেনিনের বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। দু বছর পরে প্রথম অল ইউনিয়ন কংগ্রেস অব সোভিয়েতসে ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। ১৯২২ সালের ২০ নভেম্বর লেনিন শেষবারের মত জনসাধারণের সামনে ভাষণ দেন এখানেই। বলশই

থিয়েটারের সামনে প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক মর্মর ফলকে লেখা আছে।

বলশই থিয়েটার থেকে সেন্ট্রাল চিলড্রেনস থিয়েটার বেশী দূর নয়। ১৯২১ সালে বিপ্লবের কয়েক বছর পরেই ওঁরা ভাবতে শুরু করেন ছোটদের জন্য কিছু একটা করা দরকার। ১৯২১ সালে তৈরি হয় চিলড্রেন্স সেন্ট্রাল থিয়েটার। এখন সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু থিয়েটারের সংখ্যা ৪৮, ৩০০ নাটক তাঁরা তৈরি করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশু থিয়েটার প্রসঙ্গে সোভিয়েতের শিশু নীতি সম্পর্কে কিছু বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদেশে এসে দেখেছি শিশু, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক ও শ্রমিক এদের জন্য সমাজে একটা বড় আসন পাতা। সোভিয়েত সরকার গভীরভাবে বিশ্বাস করে ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। তাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সামুহিক বিকাশের দিকে প্রথম থেকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আর একটি বড় ব্যাপার হ'ল লোকসংখ্যা কম থাকার দরুণ কোন শিশুই সমাজ ও পরিবারে অবাঞ্ছিত নয়, বরং রাষ্ট্র চায় আরও শিশু জন্মাক। এমনকি কুমারী মায়ের শিশুও সেদেশে সমান মর্যাদা পায়। সংবিধান তাকে আইনগত সমস্ত অধিকারই দিয়েছে।

ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের ফারাক হ'ল, ধনতান্ত্রিক দেশে শিশুর যাবতীয় দায় দায়িত্ব তার পিতা মাতার, পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব দরিদ্র পরিবারের কাছে এক বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। মা-বাবা শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক অপরাধ বোধের তাড়নায় ভুগতে থাকে।

আমাদের দেশে একটি শিশুকে ভালমত মানুষ করা কি ব্যয় সাপেক্ষ তা একবার চিন্তা করুন। আমি হিসাব করে দেখেছি একটি ছেলেকে তার গর্ভধারণ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত মানুষ করতে ব্যয় পড়ে কম করে একলক্ষ টাকা। এর মধ্যে আমি তার চিকিৎসা, একটি ইংরাজী মাধ্যম

স্কুলে পড়ার খরচ, টিউটরের বেতন ও জামা কাপড়ের খরচ ধরেছি। এই খরচ শুধু তাকে বাড়িতে রেখে পড়ালে। হসটেলে রাখলে খরচ দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। মেয়ে হ'লে এই সঙ্গে বিয়ের খরচ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ যোগ করুন। যেহেতু এই বিরাট অঙ্কটি আমাদের একসঙ্গে বার করতে হয় না তাই আমরা টের পাইনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ছেলেকে জন্ম থেকে ২ বছর পযন্ত ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। সে জায়গায় সোভিয়েত ইউনিয়নে সন্তান পিছু ব্যয় খুব সামান্য। কিনডারগারটেন স্টেজ শুধু ফ্রি নয়, তারপর সমস্ত শিক্ষা ফ্রি। মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যু পযন্ত চিকিৎসা ফ্রি। দেড়লক্ষ শিশু চিকিৎসক ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ জড়িত আছেন ২৭ হাজার মেটারনিটি কনসালটেশন ক্লিনিকের সঙ্গে। জন্মের এক বছরের মধ্যে মাসে একবার করে চিকিৎসক তাঁকে দেখবেন বিনামূল্যে, এবং এসময় একাধিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হবে। সোভিয়েত বাজেটের ৫০০ কোটি রুবল প্রতিবছর খরচ হয় চাইল্ড্‌কেয়ার সেণ্টার চালাতে। তৃতীয় বিশ্বে প্রতি বছর দেড় কোটি শিশুর মৃত্যু হয় অপুষ্টিতে, সেখানে সোভিয়েতে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম।

শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য ও দেশের রাষ্ট্র থেকে কত আয়োজন, পায়োনিয়র ক্যাম্প, ছোটদের নাটক, গান, ব্যালে স্কুল, খেলাধূলা স্কুল, টিন এজার ক্লাব, প্রকৃতি প্রেমিক শিশুদের জন্য কেন্দ্র, ডে-কেয়ার সেণ্টার সারা দেশ জুড়ে শিশুর সামূহিক বিকাশের জন্য কতনা কর্মকাণ্ড।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত পায়োনিয়রের সদস্য হওয়া যায়। তাদের সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ। একলক্ষ ইয়ং পায়োনিয়র স্কোয়াড আছে দেশজুড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ছোটবেলা থেকে পাঠক্রম, আলোচনা, শিবির ও, সমাবেশের মাধ্যমে শিশু তার চৈতন্য বোধের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। এতে করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ

গড়ে তুলতে খুব সুবিধা হয়। দেশের সমস্ত মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয় তাহলে দেশ গঠনের পথে আর কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সব কিছু তুরন্ত গতিতে করে ফেলতে পারবে তার কারণ কোন ব্যাপারেই বিরোধিতা নেই। জনমত প্রথম থেকেই তৈরি। রাষ্ট্র বা পার্টি যে নীতি নির্দ্ধারণ করবে দেশের লোক তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে। সেই ভাবেই ছোট বেলা থেকে ট্রেনিং, সেই ভাবেই পঠক্রম তৈরী। মার্কস বাদ লেনিন বাদের শিক্ষা ওদের ক্লাশ রুমেই হয়ে যায়। তারপর এ সম্পর্কে নানা তাত্ত্বিক আলোচনা ও চর্চা ক্রমাগত চলতে থাকে পায়োনিয়ার শিবিরে বা তরুণ কম্যুনিস্ট সংগঠন কমসোমল এ। বিভিন্ন দেশের সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র গড়ে তুলতে চায়। ছুটির সময় তারা বিদেশে যায়, বিদেশী ছেলেমেয়েরা তাদের কাছে আসে। ইন্টারন্যাশনলিস্ট ফ্রেণ্ডশিপ ক্লাব ৪৫ হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব করে দিয়েছে। কখনও তারা সৌভ্রাত্র দেখাবার জন্য বিদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট কাজ করে নেয়। যেমন ইয়ং পায়োনিয়ররা একবার হ্যানয়ের শিশু হাসপাতালের জন্য কিছু গাছ গাছড়া সংগ্রহ করে দিল। ইয়ং পায়োনিয়র সংগঠন ৮০টি দেশের ১০০টি প্রগতিশীল শিশু সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুনীতির সবচেয়ে বড় দিক হ'ল শিশুদের জন্য ভাবা। রাশিয়ায় প্রতি চারটি বই প্রকাশিত হলে একটি বই প্রকাশিত হয় শিশুর জন্য। ৭ টি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন রয়েছে শিশুদের জন্য। প্রতিটি চতুর্থ ফিল্ম তৈরি শিশুদের জন্য। (১৯৮১-১৯৮৫) শিশুদের জন্য বরাদ্দ হয় ন' হাজার মিলিয়ন রুবল। যেহেতু সোভিয়েত মায়েরা অধিকাংশই চাকরি করেন সেহেতু তাদের বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় গড়ে তোলা হয়েছে শিশু-কেন্দ্র। দেড়কোটি শিশু তার সুযোগ গ্রহণ করে। আর সাত বছর

বয়স থেকে একটি ছেলেমেয়ে যখন স্কুলে যায় তখন তার স্কুলের পড়া-শোনার জন্য রাষ্ট্র সন্তান পিছু দুহাজার রুবল করে খরচ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে শিশু মৃত্যুর হার দশভাগ কমিয়ে আনতে পেরেছে এটি তাদের সর্বাত্মক শিশু নীতিরই ফলশ্রুতি আগস্ট মাসে যখন সারা সোভিয়েত দেশে স্কুলে নতুন সেসন শুরু হয় তখন যেন দেশ জুড়ে উৎসব পড়ে যায়। দোকানে দোকানে কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে লেখা—নতুন বর্ষারম্ভে অভিনন্দন। সারা দেশ জুড়ে নতুনকে বরণ করার জন্য সে কা সমারোহ। বিদ্যারম্ভ কোন পারিবারিক ব্যাপার নয়—সেটা যেন গোটা জাতিরই এক গর্বের মুহূর্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম দ্রষ্টব্য হল পাতাল রেল। আটটি শহরে এখন ৩১০ কিলোমিটার পাতাল রেল রয়েছে। গিয়ে শুনলাম — আরও দশটি শহরে পাতাল রেলের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, পাতাল রেল স্টেশনগুলি এক একটি বিলাস-বহুল প্রাসাদ। এটা খুব আশ্চর্য লাগে যে জার আমলে যে বিলাসিতার উদ্দাম স্রোত বয়ে গিয়েছিল বিপ্লবের পরেও সেই বিলাসধারা অব্যাহত। তবে তফাৎটা জারের সময় ওই বিলাস-ব্যসন শুধু আবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এখন তা জনগণের জন্য মুক্ত। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিটি নতুন হোটেল, সাংস্কৃতিক হল, অফিস বাড়ির স্থাপত্য ইনটিরিয়র ডেকরেশন, নির্মাণ উপ-করণের ব্যবহার দেখলে কোন কোন ধনবাদী রাষ্ট্র থেকে এগুলিকে আর আলাদা মনে হয় না। ধরা যাক লেনিনগ্রাড শহরের হোটেল লেনিনগ্রাডটির কথা। এই হোটেলে বসে থাকলে মনে হবে আমেরিকার সবচেয়ে সেরা হোটেলেই বোধহয় বসে আছি। মেটরো রেল স্টেশনগুলি দেখে মনে হয় ওরা বোধহয় জারের উইনটার প্যালেসের সঙ্গে টেক্কা দেবার উদ্দেশ্যেই এগুলি তৈরি করেছে। আমি শুনলাম মস্কো শহরে ১৪টি মেটরো স্টেশন করতে যত মারবেল খরচ হয়েছে, গত ৩০০ বছর ধরে জার তাঁর সবকটি

প্রাসাদ বানাবার জন্যও এত মারবেল খরচ করেননি। মনে রাখতে হবে মস্কো মেটরো উদ্বোধন হয় ১৯৩৫ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক মুখে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই আজকের মত ছিল না। সে সময় তো সবে গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে উঠে রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর সমাজ সবে থিতু হচ্ছে।

মস্কো মেটরো স্টেশনের প্ল্যাট-ফরমগুলো মারবেল পাথরের মোজাইক করা। প্রত্যেক স্টেশনে পাথরের রঙ আলাদা আলাদা। আর থামগুলি দেখলে মনে হয় বুঝি প্রাচীন ইওরোপে আবার ফিরে গিয়েছি। মাথার সিলিং গুলো পর্যন্ত কাজ করা। ইউটিলিটিকে এসথেটিকসে রূপান্তরিত করতে পারে কারা? প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতি যাদের মোহ আছে। আর আছে রুচিশীল মন। অর্থ এখানে সবচেয়ে বড় নয়। রুশদের সেই বনেদি মনটাকে বিপ্লব মেরে ফেলতে পারেনি। আমার মনে হয়েছে রুশীরা বাইরে কমনার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অ্যারিসটোক্র্যাটিক। ওরা কোথাও পুরাতন ঐতিহ্যকে বর্জন করেনি। লেনিনগ্রাডে যে হোটেলে ছিলাম, ১৫০ বছরের নাকিপুরনো। আমাদের দেশে হলে কবে সেটিকে গুড়িয়ে ম্যাচ বাকস বাড়ি তোলা হত। গোটা লেনিনগ্রাড শহরটাকে সেই পেটরোগ্রাড আমলের আদলেই রেখে দেওয়া আছে। একটি পুরানো বাড়িও ভাঙা হয়নি। জার আমলের একটি স্ট্যাচুও নামিয়ে ফেলা হয়নি। জারেরা স্বয়ং এমনকি তাঁদের সেনাপতিরাও দিব্যি স্ট্যাচু হয়ে অধিষ্ঠান করছেন। অবশ্য জারের সামার প্যালেস, ক্রেমলিনের একাংশ এখন পাবলিক মিউজিয়ম। কিন্তু কী অদ্ভুত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি জিনিস সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মনে হবে বুঝি কাল তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ইতিহাস ও পুরাতনকে যেমন সারা ইউরোপ বুকে আঁকড়ে ধরে আছে' রাশিয়াও সেই ধারা থেকে সরে আসেনি। সরে যে·আসেনি তা মিউজিয়মগুলো প্রমাণ। কত যে মিউজিয়ম তার অন্ত পাওয়া ভার। সোভিয়েত রাশিয়ায় সব সমেত মিউজিয়মের সংখ্যা ১৪৫০। এর মধ্যে শুধু

লেনিনগ্রাড শহরেই ৫০টি মিউজিয়ম। মস্কো শহরে প্রাচীন মিউজিয়মের সঙ্গে আধুনিক অসংখ্য মিউজিয়ম গড়ে উঠছে স্কুলে, কলেজে, কারখানায়।

মস্কো শহরে মেটরো রেলের ১১৫টি স্টেশন। আয়তন ১৯৪ কিলোমিটার। আরও ৩০ কিলোমিটারপথের সম্প্রসারণ চলছে। সোভিয়েত সরকার ঠিক করেছেন পনের থেকে কুড়ি লক্ষ কোন শহরের জনসংখ্যা হলেই সেখানে একটি করে পাতাল রেল হবে।

মস্কো ও লেনিনগ্রাডে যে টিউব ট্রেন দেখলাম তা অত্যন্ত সুদৃশ্য। আমি নিউইয়র্ক, টোকিও লনডনের টিউব ট্রেন দেখেছি। এদের মধ্যে সুদৃশ্য ও ছিমছাম টিউব ট্রেন নিঃসন্দেহে টোকিও ও মস্কোতে। নিউইয়রর্কের টিউব ট্রেনের তো ঝরঝরে অবস্থা। পৌনে এক মিনিট অন্তর ট্রেন আসে। মস্কোতে ট্রেনের পাংচুয়ালিটি হার শতকরা ৯৯.৯৮ ভাগ। দিনে যাত্রী বহনের সংখ্যা ৭৫ লক্ষ।

শুনলাম মস্কো মেটরো তৈরির ইতিহাসও বেশ বিচিত্র। একজন মুখপাত্র বললেন : ১৯৩১ সালে মেটরোর কাজ শুরু হয়। তিনবছরে মধ্যেই ১১.৬ কিলোমিটার লাইন পাতা শেষ হয়ে যায়। গ্র্যানাইট মারবেল পাথরের ১৩টি স্টেশন তৈরি হয়ে যায় তিন বছরের মধ্যেই। ১৯৩৫ সালের ১৫ মে নিয়মিত টিউব ট্রেন চলতে শুরু হয়।

১৯৩১ সালে মস্কো যখন পাতাল রেল তৈরি করে তখন মস্কো শহরের প্রধান যানবাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি। মস্কো মেটরোর কাজ করার জন্য সারা সোভিয়েত থেকে ৭৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী মানুষ এসে-ছিলেন। চাকরি নয়—পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে দেখিয়ে দেওয়া যে একটি অনগ্রসর দেশ শুধু প্রতিজ্ঞার জোরে কিভাবে একটা বিরাট কাজ করতে পারে। তাঁদের সম্বল ছিল কোদাল আর বেলচা। আজ সোভিয়েত মেটরো বিশারদরা ভারত সহ দুনিয়ার অনেক দেশে পরামর্শ-দাতার কাজ করছেন। সেদিন বিদেশী পরামর্শদাতারা এসেছিলেন সোভিয়েত মেটরো তৈরিতে পরামর্শ দিতে। তাঁরা বলেছিলেন, দিনে এক মিটারের বেশি টানেল কাটা যাবে না। কিন্তু সোভিয়েত

ইনজিনিয়ররা নতুন টানেল কাটার মেশিন উদ্ভাবন করলেন। দেখা গেল দিনে সাড়ে চার মিটার করে টানেল কাটা হচ্ছে।

ধনী দেশগুলি এতদিন ধরে পাবলিক ট্রানসপোরট সিসটেমকে অবহেলা করেছে। পশ্চিম জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেন সারভিসকে প্রচণ্ড লোকসানের ধাক্কায় পড়তে হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে সোভিয়েত রাশিয়ায় পাবলিক ট্রানসপোর্ট যথেষ্ট উন্নত। মস্কো শহরের জনসংখ্যা ৮০ লক্ষের মত। আগেই বলেছি আয়তন উত্তর থেকে দক্ষিণে ৪০ কিলোমিটার আর পূব থেকে পশ্চিমে ৩৫ কিলোমিটার। কিন্তু যান-বাহনের এত সুবিধে আর রাস্তাঘাট এত ভাল যে দূরত্ব কোথাও জীবন-যাত্রার প্রতিবন্ধক নয়। প্রচুর রাস্তা ও প্রতিটি রাস্তাই চওড়া। প্রতিটি রাস্তার দুপাশে গাছ। ফুটপাথের মাঝে ঘাস। হিসাবটা শুনে অবাক লাগল যে মস্কোর সমস্ত রাস্তাকে যদি পরপর জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৫০০ কিলোমিটার। নয় রকমের পরিবহন ব্যবস্থা মস্কোতে। শহরের সীমার মধ্যে ট্রেন, ট্রলি, ট্রাম ও বাস, মিনি-বাস (ফিকসড রুট ট্যাকসি) ও স্টিমার। শহরের বুক চিরে চলে গেছে মস্কো নদী। তবে মস্কো নদী খুব একটা চওড়া নয়। শহরের মাঝখানে নদী থাকলে গোটা শহরের চেহারা পালটে দেয়। এটা কতবড় ভাগ্য সেই শহরের মানুষদের। একমাত্র কলকাতার মানুষই বুঝি প্রকৃতির এই অযাচিত দান হাতে পেয়েও অবহেলায় তাকে পায়ে ঠেলে।

মস্কো শহরের ভেতরেও তিনটি বন্দর, ৫০টি স্টিমার জেটি ও ফেরিঘাট রয়েছে। কিন্তু কোথাও ঘিঞ্জি লাগে না। লাগে না কারণ শহরের কোথাও সরু গলি আর অবিন্যস্ত গজিয়ে ওঠা ছাউনি ও দোকান নেই বলে।

ট্রলিবাস আর ট্রামের রুট সংখ্যা ৭২৫টি।

সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রতি বছর ট্রাম বাসে ভাড়া বাড়ে না। বহু বছর ধরে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া একই আছে। মেটরোর ভাড়া ৫ কোপেক। যেখানেই যান এক ভাড়া এবং সারাদিন ধরেই

আপনি ওই ৫ কোপেকের টিকিট কেটে ঘুরতে পারেন। ট্রলিবাস ও বাসে ভাড়া ৪ কোপেক, ট্রামে তিন কোপেক। ট্রামে-বাসে কনডাকটর নেই। ঢোকবার সময় মেশিনে পয়সা দিয়ে যাত্রীরা নিজেরাই টিকিট কেটে নেন। প্রতি যাত্রী পিছু বছরে ৭'৪২ রুবল ভাড়া সরকার ভরতুকি দেন। মস্কোর পরিবহন কিন্তু সেই অর্থে লোকসানে চলে। সরকার বছরে ভরতুকি দেন ৪ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল। কলকাতায় স্টেট বাসকে ভরতুকি দেওয়া হয় বছরে ১২ কোটি টাকা। ভরতুকিটা বড় কথা নয়—বিশ্বের সর্বত্র নগর-পরিবহন ভরতুকি দিয়ে চালাতে হয়। কিন্তু কলকাতাব সঙ্গে তফাৎ হল ১৫ কোটি টাকা ভরতুকি দেবার পরও জন-সাধারণ ট্রামে বাসে উঠতে পারেন না। মস্কো শহরে মোটর বাসের সংখ্যা ৬ হাজার, ট্রলিবাস ২৫০০, টিউব রেল ১২৭০টি। জনসংখ্যার দিক থেকে (মফস্বল থেকে আগত নিত্যযাত্রী ধরে) কলকাতায় জনসংখ্যা মস্কোর কাছাকাছি। সে তুলনায় কলকাতায় দিনে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে দু হাজার বাস আর তিনশ ট্রাম বার হয়।

মসকোতে ১৬ হাজার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, যুদ্ধে পঙ্গু ব্যক্তি, শহর সোভিয়েতের ডেপুটিরা (কাউনসিলর) ডাক পিওনরা ও পুলিশেরা মসকো শহরের যানবাহনে বিনা ভাড়ায় যেতে পারেন। ছাত্র ও শিশুদের জন্য অর্ধেক ভাড়া। ট্রেনে বাসে মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা আছে। মেটরোর মাসিক টিকিট লাগে তিন রুবল। মোটর বাস তিন রুবল, ট্রলিবাস ২ রুবল ৪০ কোপেক, এছাড়া ট্রাম বাস ও মেটরোর মিলিত একটি মাসিক টিকিট আছে তার ভাড়া মাসে ৬ রুবল। ছাত্রদের বাসের মাসিক টিকিট ২ রুবল ৫০ কোপেক। ১ রুবল দিলে ট্রলিবাস ও ৮০ কোপেক দিলে ট্রামে ভ্রমণ করা যায়।

যাত্রী সংখ্যার মোট ৩৭ ভাগ মেটরো ব্যবহার করেন। রোজ দেড় কোটি ব্যক্তি জল পরিবহন ব্যবহার করেন। ছুটির দিন ছাড়া সাধারণ দিনে ছ'টা থেকে রাত একটা পর্যন্ত মেটরো চলে। ছুটির দিনে রাত দুটো পর্যন্ত। ট্রলিবাস খোলা থাকে ভোর ছ'টা থেকে রাত একটা।

এছাড়াও আছে সারফেস বৈদ্যুতিক ট্রেন। ৩০ লক্ষের মত যাত্রীবহন করে ট্রেনগুলি। শহর সীমার মধ্যে ভাড়া ১০ থেকে ২০ ...

মস্কোর রাস্তায় ৮৬০০টি মোটর বাস ট্রাম ও ট্রলি ...

মস্কোর যানবাহনের ইতিহাস পুরনো। ১৮৯৫ সাল ... ট্রাম গাড়ি। বৈদ্যুতিক ট্রেন ১৯২৯ সাল থেকে চলছে। ... হয় ১৯৩৩ সালে। বাস ১৯২৪ সালে। তবে সংখ্যায় তা ... না। সুতরাং শহরে ঘোড়ার গাড়িই ছিল প্রধান যানবাহন

মস্কো শহরে ১৬ হাজার ট্যাক্সি আছে। এছাড়া ...৪ কাটের ট্যাক্সি বা মিনিবাসের মত তার সংখ্যা ৪২০। মস্কোর ট্যাক্সি ভাড়া প্রতি কিলোমিটার ২০ কোপেক। ২০ কোপেক সারভিস চারজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্যাক্সির বেশ ঘাটতি পড়ে। আমি অনেকবারই মস্কো ও লেনিনগ্রাডে ট্যাক্সি পাইনি, ট্যাক্সি রিফিউজ্যালও বেড়ে চলেছে (আমার বন্ধু কল্যাণ ভদ্র শুনলে খুশি হবেন)।

সব ট্যাক্সিই সরকারী ট্যাক্সি। ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত তাঁরা একটা বেতন পাবেন আর ৬০ রুবলের ওপর যা আয় হবে সেটা তাঁর কমিশন। ৬০ রুবল দিনে জমা দিতে হয় সরকারকে তবে আট ঘণ্টার বেশি কেউ খাটবেন না। আমাকে একজন প্রবাসী ভারতীয় বললেন, ডিউটি শেষ হয়ে গেলে কোন টাক্সি আর যাত্রী তোলেন না।

তবে টাক্সির বিকল্প হিসাবে বাঁচিয়ে দেন কিছু কিছু প্রাইভেট গাড়ি। খালি প্রাইভেট গাড়ির চালককে অনুরোধ করলে তাঁরা লিফট দেন। তবে বিনামূল্যে নয়। ট্যাক্সি ভাড়ার মতই কয়েক রুবল হাতে গুঁজে দিতে হয়। কোন কোন সরকারি গাড়ির চালকও অতিরিক্ত রোজগারের লোভে গাড়িতে যাত্রী তোলেন।

মসকোর রাস্তায় একদিন দেখলাম পুলিশ এসে এক গাড়ির ড্রাইভারকে আটকালো। আমার সহযাত্রী ভারতীয় বললেন : লোকটি উটকো প্যাসেঞ্জার তুলেছিল সরকারী গাড়িতে। ধরা পড়ে গেছে। কপালে দুঃখ আছে বেচারার।

সে কোন প্রাণবন্ত শহরের লক্ষণ হল তার বৃদ্ধি কোথাও থেমে [illegible] জীবনের ধর্ম, শহরের ধর্মও তার বৃদ্ধি। কিন্তু [illegible] দিকে ঠেলে দেয় না, তাকে শক্তিশালী করে [illegible] ন। প্রায় হাজার বছর ধরে মস্কো শহরের [illegible] শতাব্দীর পর শতাব্দী বহে চলেছে মস্কোভা [illegible] তা সত্ত্বেও তার গতি আজ অবরুদ্ধ নয়। [illegible] প্রবাহিত স্রোতস্বিনী।

সেই কবে ১১৪৭ সালে মস্কো শহরের কথা প্রথম উল্লিখিত হয় পুরাতন গ্রন্থে। ১১৫৬ সালে কাঠের কেল্লা রূপে গড়ে ওঠে ক্রেমলিন আর আজও তার জীবনপঞ্জীতে নানা উল্লেখযোগ্য সংযোজনের কাহিনী। ১৬৫৫ সালে প্রথম কাপড়ের কল তৈরি হয় এই শহরে। ১৭০৩ সালে প্রথম রুশ সংবাদপত্র ভেদোমস্তির প্রকাশও এই শহর থেকে।

আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় একশ বছর আগে তৈরি হয়ে ছিল রুশ বিশ্ববিদ্যালয় (১৭৫৫ সালে)।

১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠা প্রথম থিয়েটার ম্যালি থিয়েটারের। ১৮২৫ সালেতে বলশই থিয়েটারই প্রতিষ্ঠা হল।

১৮৫১ সালে প্রথম ট্রেন চলে মস্কোতে। পিটসবার্গ মস্কো লাইন যে পথ দিয়ে এক রাতের ট্রেনে আমি মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড গিয়েছিলাম। ১৮৯৫ সালে মস্কোতে প্রথম চলেছিল ট্রাম।

আধুনিক মস্কোর বয়স মাত্র কয়েক দশকের। ১৯৫১-৫৩ সালের মধ্যে প্রথম স্কাইস্ক্র্যাপার ওঠে মস্কো শহরে। ডাউন টাউনের ঘিঞ্জি এলাকা ছেড়ে ১৯৫৩ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস উঠে যায় লেনিন হিলে। রেডস্কোয়ার যদি মস্কোর মগজ, মার্ক্স প্রসপেক্ট যদি ধমনী, কালানিন প্রসপেক্ট যদি হৃদপিণ্ড হয়, তাহলে লেনিন হিল মস্কোর হৃদয়।

মস্কোর হৃদয় শান্ত সমাহিত এক অপরূপ স্নিগ্ধতায় ভরা।

মস্কোতে একটি গির্জা, একটি টাইমস্কোয়ার কিংবা একটি

পিকাডালি নেই কিন্তু লেনিন হিলের মত এত অনুপম ছায়াঘন নিসর্গ শোভা আর কোথায় আছে? শহরের মধ্যে এ যেন আর এক শৈলশহর যেখানে দাঁড়ালে গোটা মস্কোকে দেখা যায় বৈমানিকের দৃষ্টিতে।

লেনিন হিল মস্কোর এক প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ টিলা—সবুজ গাছে ঘেরা, অসংখ্য পাখীর কূজনে মুখরিত। এখানে এলে নিমেষের মধ্যে পাওয়া যায় শৈলপুরীর স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ।

এই সেই লেনিন হিল যার আদি নাম ছিল ভোরোবাইওভি হিল। ১৮২৬ সালে দুই দেশপ্রেমিক তরুণ আলেকজাণ্ডার হার্জেন ও নিকোলাই ওগারেভ এই অরণ্যভূমিতে এসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অত্যাচারি জার শাসকদের কবল থেকে তাঁরা রাশিয়ার মুক্তি আনবেন। বিপ্লবের আগে এখানে বিপ্লবী শ্রমিকরা মে দিবসের জমায়েত করতেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় এই লেনিন হিল পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। এখান থেকে তারা কামান দাগে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে।

লেনিনস্কিয়া গোরি মেটরো স্টেশন থেকে সোজা চলে যাওয়া যায় লেনিন হিল। ট্রেন ব্রিজের ওপর দিয়ে পার হয় মস্কোভা নদী। নদীর ওপারে লেনিন হিলের আবাসন এলাকা কমসোমল প্রসপেক্ট। একটু হেঁটে যাওয়ার পর এসকেলেটরে চেপে ৫০ মিটার উঠলেই লেনিন হিলের ওপরে পৌছনো যায়। লেনিন হিলে দর্শনীয় অনেক কিছুই আছে যেমন মস্কো সার্কাস, পায়োনিয়র প্যালেশ, নামুম্বা ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভারসিটি, কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে লেনিন হিলের খ্যাতি মস্কো নমোনোসভ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।

মনে রাখতে হবে পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের দেশের মত এত গ্র্যাজুয়েট প্রসব করেনা। প্রায় দুশো বছর ধরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র এক লক্ষ ত্রিশ হাজার গ্র্যাজুয়েট করেছেন। এর মধ্যে ৫০ ভাগ গ্র্যাজুয়েট হয়েছে বিপ্লবের আগে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টি বিভাগে ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়ছেন। এছাড়া আছেন ২৫০০ বিদেশী

ছাত্র। ৭০০ অধ্যাপক ; ২৫০০ ক্যাণ্ডিডেট অব সায়েন্স ও আকাদামি অব সায়েন্সের ১০০ করেসপনডিং সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি। ২৩০ হেক্টর জমি নিয়ে ক্যাম্পাস। তাতে আছে ৪০টি ব্লক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর রয়েছে বটানিক্যাল গার্ডেন, স্পোর্টস স্টেডিয়াম, ও বড় পার্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর আছে ৩৮০ মিটার উঁচু ৩২ তলা টাওয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর একটি হল রয়েছে যেখানে ১৫০০ ছাত্র বসতে পারে। হসটেল আছে ৬ হাজার ছাত্রের জন্য, ১৯টি লেকচার থিয়েটার, ১৪০টি অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়াম নিয়ে কমপ্লেক্স। লেনিন হিলের মেটরো লাইন লেনিনস্কিয়া গোরি থেকেও আরও তিনটি স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। পরের স্টেশন ইউনিভার্সিটি টেট। তারপরের স্টেশন প্রসপেক্ট ভেরান্দাস্কগো, তারপর ইউগো জাপাডানিয়া।

লেনিন হিলে ইউনিভার্সিটি চত্বরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলাম মস্কো শহরের দিকে। সন্ধ্যা নামছে মন্দ মন্থরে। মস্কো শহরের বুকে সারি সারি জ্বলে উঠেছে আলো। মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যগ্রহ থেকে আমরা তাকিয়ে রয়েছি মস্কো শহরের দিকে। এত কাছে তবু এত দূরে। এত স্পষ্ট অথচ এত বিস্ময়ের কুহেলি ঘেরা।